ভাদ্র ১৩৮৫

আনন্দমেলা

বিশ্বকাপের
সেরা ষোলটি দেশের
সেরা ষোলজন
খেলোয়াড়ের
রঙিন ছবি

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

যমজ ভাই-বোন রামু রীতার জন্মদিনের পার্টি দারুণ জমে ছিল। ওদের মা ওদের জন্যে একটা বিরাট কেক বানিয়ে ৬ টা ক্যাণ্ডেল লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ওদের সব ছোট্ট বন্ধুরা পার্টিতে এসেছিল। ওদের বাবা দুজনকে ১০ টাকা করে আর মা ৫ টাকা করে উপহার দিলেন। ওরা অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস এবং টাকা ও মিষ্টি উপহার পেল। রামু ঝটপট দোকানে গিয়ে অনেক গল্পের বই ও একটা খেলনা কিনে ফেলল। কিন্তু রীতা বলল ওর পাওয়া টাকা সঞ্চয় করবে। একথা শুনে রামুর কি হাসাহাসি। রীতা বাবার সঙ্গে কাছের স্টেট ব্যাঙ্ক-এ গিয়ে তার পাওয়া সব টাকা জমা দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলল। এখন তার একটা নিজস্ব পাস বই হল। সে এখন থেকে তার হাত খরচার পয়সা বাঁচিয়ে এতে জমাতে থাকল। এইভাবে তার সঞ্চয় ক্রমে বেড়েই চলল। এদিকে এসব দেখে রামু অবাক, মুখের হাসি বন্ধ। তার কেনা গল্পের বই ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই, খেলনা ভেঙে চুর, চকলেট টফি সব খতম। আর এদিকে তার পকেটও ফাঁকা। এরপর সে হাতখরচা পেতেই রীতার সঙ্গে সোজা স্টেট ব্যাঙ্ক-এ গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলল। নিজের নামে পাস বই পেয়ে তার কি গর্ব, এখন সে বলে "এখন আমি আর সব পয়সা খরচা করছি না, আমি সঞ্চয় করতেই থাকেব!"

সমাপ্ত

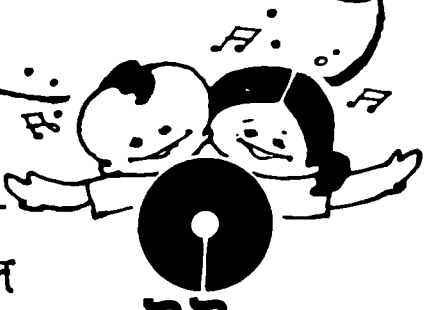

ছোট্টরা, রামুর মত তোমরাও সব পয়সা খরচা করে ফেল না। রীতার মত সঞ্চয় কর। বাবা বা মাকে বলে স্টেট ব্যাঙ্কে তোমাদের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে নাও, আর দেখ তোমাদের টাকা কিভাবে বেড়েই চলে।

স্টেট ব্যাঙ্ক

CHAITRA-SBI-330 BEN

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার
কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র

আনন্দমেলা

ভাদ্র ১৩৮৫, আগস্ট ১৯৭৮, চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা
দেড় টাকা

গল্প
হোহো-হিহি । সুব্রত সেনগুপ্ত ৭
হাতি বনাম জীপ । অজিতকুমার সেন ১৯
অজগরের আদর । সঙ্কর্ষণ রায় ৩২

বিশেষ রচনা
কালিঝোরা । হিমানীশ গোস্বামী ৪

ছড়া
শানুর কাণ্ড । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫
ফুস মন্তর । অশোক মিত্র ৩৩

আত্মকথা
খেলতে খেলতে । চুনী গোস্বামী ১৫

উপন্যাস
অলৌকিক । বিমল কর ১১
বন্ধ ঘরের আওয়াজ । সমরেশ বসু ৩৭

কমিক্স
বিশ্বকাপ-ফুটবল ২১ ● গোয়েন্দা বাজ ২৫ ● টারজান ২৬
টিনটিন ৩০ ● গাবলু ৩৬ ● নোলেদা ৫৩

লেখাপড়া
মজার পড়া । কুম্ভক ৪১ ● সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৪২

ম্যাজিক
লোডশেডিং ম্যাজিক । পি সি সরকার, জুনিয়র ৪৩

খেলাধুলো
বিশ্বকাপের খেলায় । মুকুল দত্ত ৪৪
আবার ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট । অশোক দাশগুপ্ত ৪৯
খেলার মাঠে গণ্ডগোল । পুষ্পেন সরকার ৫০

ধাঁধা-মজা-রহস্য
শব্দ-সন্ধান ২৮ ● ধাঁধা ২৮ ● কিসের ফোটো ২৯
উত্তর বটে ২৯ ● মজার খেলা ২৯ ● শুধু একবার ২৯ ● আটখানা ২৯

অন্যান্য লেখা
তোমাদের পাতা ২৩ ● দুঃসাহসিক অভিযান ৪২ ● মণিমেলার খবর ৫২

রঙিন ছবির পাতা
সেরা ষোলটি দেশের সেরা ষোলজন খেলোয়াড় ২২
মারিও কেম্পেস ৫৬

প্রচ্ছদ কমল সাহা

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি·আই·টি· রোড কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

কালিঝোরা

হিমানীশ গোস্বামী

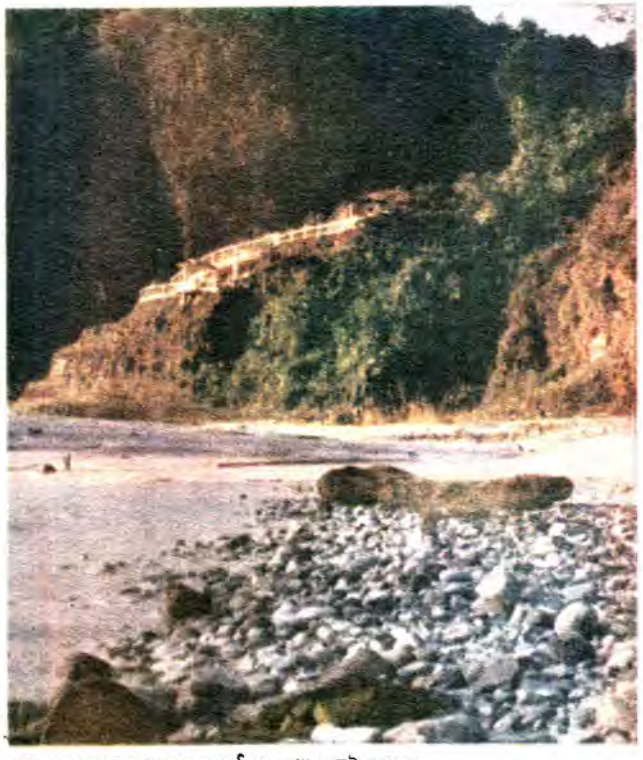

পাহাড়ের গায়ে ঘোরানো রেলিং, তার পরেই বাংলো।

নদী শুকনো। বালির বিছানায় বসে আছে ভাইবোন।

ঝুরঝুরে বালির উপরে রঙিন পাথরের ছড়াছড়ি।

কালিঝোরা নামটা কেন হল? ওখানে কি কালীর মন্দির কখনো ছিল? নাকি অন্য কিছু? স্থানীয় লোকেরা বলেন, ওসব আমাদের জানা নেই। কালিঝোরা ডাকবাংলোর আশেপাশে দু চারজনকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তাঁরা খবর রাখেন না। কালিঝোরা কোথায়? তোমরা যারা শিলিগুড়ি বা তার আশেপাশে থাকো, তাদের অবশ্য বলে দিতে হবে না যে, জায়গাটা শিলিগুড়ি থেকে আঠারো মাইল দূরে তিস্তা নদীর ধারে। যখন তিস্তা নদীতে তেমন জল থাকে না, তখন তিস্তার বিরাট বালির বিছানার ভিতর দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যায় বরফগলা জল। আর ঐ বালির দানাগুলো এমন চমৎকার মিহি যে, তার উপর দিব্যি গড়াগড়ি দেওয়া চলে. একটুও গায়ে লাগে না। উঠে দাঁড়ালে বালি সব ঝরে যায়। কখনো মনে হয় একেবারে যেন সমুদ্রের ধার! সত্যিই উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীর দৃশ্যের তুলনা নেই। এখানে রয়েছে গহন জঙ্গল, বিরাট পর্বত, পরিষ্কার জলের নদী। শিলিগুড়ি বা আশেপাশের অনেক জায়গা থেকে এখানে অনেকেই আসেন পিকনিক করতে এই বালির উপরে। আর অসুবিধে তো কিছু নেই। পড়ে থাকা কত পাথর রয়েছে—সেগুলোর কী আশ্চর্য সব রঙ! সেগুলোকে দিয়ে দিব্যি উনুন বানানো যায়, দেখতেও ভারী মজার। আর কাঠ? বর্ষার সময় কত গাছ তিস্তার স্রোতে ভেসে-ভেসে এসেছে, সেগুলো ভেঙে টুকরো হয়ে শুকিয়ে এখানে-ওখানে পড়ে রয়েছে, আগুন তৈরি করতে একটুও ঝামেলা নেই। প্রথমে ধরাতে অসুবিধে হলে রয়েছে শুকনো কাশের জঙ্গল, আশেপাশে কত গাছ, তার ঝরে-পড়া শুকনো পাতাও মেলে কিছু-কিছু! এখানে পিকনিক করতে হলে চাল ডাল মাছ মাংস মশলাপাতি সব নিজেদেরই নিয়ে আসতে হবে। এর কাছাকাছি কিছুই পাওয়া যায় না। অনেকে লরি ভাড়া করে এখানে পিকনিক করতে আসেন। তবে পিকনিক করতেই যে আসতে হবে, তারও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সুন্দর, গাম্ভীর্যপূর্ণ এই জায়গায় এসে একাএকাই তো বসে থাকা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এই তো গত অক্টোবর মাসের শেষ দিকে আমরা কয়েকজন মিলে ওখানে গিয়েছিলাম দু-তিন দিনের জন্য থাকতে। ওখানকার বাংলোয় আমরা ছিলাম, চমৎকার বাংলোটি —কিন্তু বাংলো তো হোটেল নয় —ওখানে যেতে গেলে পি ডবলিউ ডি-র অনুমতি নিতে হয়। সব সময় অনুমতি মেলে না। এ ছাড়া বাংলো রয়েছে এখানে আরও একটা, কিন্তু সব বাংলোয় একই মুশকিল, অনুমতি চাই আগে, নইলে নয়। তবে সকালবেলা শিলিগুড়ি থেকে এসে সন্ধেবেলা এখান থেকে চলে গেলেও মজা মোটামুটি মন্দ হয় না। সন্ধেবেলা অবশ্য তোমাদের একটু গা-ছমছম করবে। কত বড়-বড় সব গাছ এখানে রয়েছে—কত তাদের বয়স! কারুর কারুর বয়স হয়ত একশো বছর, কারুর দেড়শো, কারুর বা আরও বেশি! আর কত রকমই বা গাছ—খুঁজলে পেয়ে যাবে শাল, সেগুন গাছ। অলিভ আর শিমুল গাছ—এগুলি থেকে হয় চমৎকার সব চায়ের বাকস! আর এমন গহন জঙ্গলে দু-চারটে কি বাঘ-টাগ এদিক-ওদিক ঘুরছে না? ঘুরছেই। আর সেই সব তেনারা. যাঁরা রামের নাম শুনলে টগবগ করে ছুটে পালান? তাঁরাও রয়েছেন বই কী। সন্ধ্যার গা-ছমছম-করা অন্ধকারে যখন কাস্তের মত চাঁদ আকাশে টুপ করে উঠে পড়ে গাছের আড়াল

দিয়ে, তখন ঐ যে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কে কাঁদে? কে কানের কাছে ফিসফিস করে কথা কয়? তাদের কথা একটু-একটু ন্যাকি-সুরের বলেই যেন মনে হয়! আর ঐ যে জঙ্গল ভেদ করে খচমচ আওয়াজ করতে-করতে কী একটা ছুটে গেল, সেটাই বা কী? আর অবিরাম ঝিঁঝির আওয়াজ, সে তো উপরি পাওনা। অন্ধকার—তার এক রূপ, আধা অন্ধকার—তার আর এক রূপ, দিনের প্রথম আলো, পাখির ডাক, সোনার রঙ গাছের ডগায়, সেও আর-একটা রূপ। আর দিনের রূপ, সেও দেখবার মত। প্রকৃতিকে দেখে-দেখে আর তৃষ্ণা মেটে না। উত্তরবঙ্গে অনেক জায়গা রয়েছে যেগুলির নাম তেমন শোনা যায় না, কিন্তু সে-সব জায়গার কী অসাধারণ রূপ! এ হচ্ছে সেই পুরনো আমলের তরাই অঞ্চল। তিস্তা এবং আরও কত নদী, কত পাথর—জলে কত মাছ। আর তারপর ভুটানের গম্ভীর পাহাড়। এদিকে চায়ের খেত মাইলের পর মাইল। জঙ্গলের মধ্যে সত্যিকারের ময়ূর—এসব এখনও আছে। তুলনা কই এ-সবের?

আর আছে ফুল। কত রকমের সীজন ফ্লাওয়ার। ডাকবাংলোর চারপাশে লাগিয়ে দিয়েছে, কী চমৎকার সেগুলোর চেহারা। কয়েকটা ফুল এমন চমৎকার দেখতে যে, তাদের দিকে তাকাতেই ফুলগুলো যেন বলে উঠল, হাঁ করে দেখছ কী, ভাল আলো থাকতে-থাকতে আমাদের ছবি তুলে নাও তো দেখি কেমন পারো! আমি আর কী করি, রঙিন ফিল্ম ভরা ক্যামেরা তো প্রস্তুতই করা ছিল, চিক করে একটা ছবি তুলে নিতেই তারা বলল, বাঃ খুব ভাল লাগল তুমি আমাদের কথা শুনেছ বলে! আমি একটু অবাক হয়ে সেখান থেকে চলে আসছি, এমন সময় শুনতে পেলাম খিল-খিল করে কারা যেন হাসছে। আমি তাকিয়ে দেখলাম—কী মজা, ঐ ফুলগুলোই হাসছে। আমি তাদের দিকে তাকাতে তারা বলল, তুমি তো আচ্ছা লোক, আমাদের নাম কী তা তো জিজ্ঞেস করলে না? আমি বললাম, তোমরা হচ্ছ অপরূপ ফুল। তাতে ফুলেরা খুশিও হল, আবার একটু অনুযোগও করল। বলল, সব ফুলই তো অপরূপ, আর সব ফুলই আবার আলাদা। আমাদেরও তো নাম আছে, সেটা জানো? আমি বললাম, তা তো জানি না। তখন তারা বলল, আমাদের নাম হল ক্রিওম। আমি বললাম, ক্রিওম আবার কীরকম নাম? এটা তো তেমন ভাল লাগছে না। তখন ওরা বলল, আমাদের আরও একটা নাম আছে—এ অঞ্চলে সকলেই সেই নামে ডাকে। আমি বললাম, সেটা কী? তারা বলল, দার্জিলিং ফ্লাওয়ার। অনেকে আবার এটাকে সহজ করে বলে ডারলিং ফ্লাওয়ার! খুব মজার ব্যাপার, না? আমি বললাম, নিশ্চয় মজার ব্যাপার।

কিন্তু আমরা শুরু করেছিলাম কালিঝোরার কথা দিয়ে। ঐ নামটা কেন হল? তিস্তা নদীর সঙ্গে কালিঝোরা এসে মিশছে যেখানে, তারই নাম কালিঝোরা। কালিঝোরাও একটা নদী—পাহাড়ী নদী। তিস্তার মত বড় নয়, তবে তিস্তার সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছে। ছোট্ট নদীর জলের রঙ ছিল এককালে কালো। তখনই এই কালো রঙের জল থেকে নামই হয়ে গেল তার কালিঝোরা। এখনও জলের দিকে তাকালে মনে হয় রঙ বুঝি একটু কালোই। কিন্তু সে চোখের ভুলও হতে পারে। আবার এটাও ঠিক হয়ত সত্যিসত্যিই এই জলের রঙ কালো। তিস্তার জল আর কালিঝোরার জলের মধ্যে যে বেশ পার্থক্য সেটা কিন্তু বোঝা যায়। কিন্তু কালিঝোরার জল কালো কেন? তার কারণ কিন্তু খুব সহজ—মংপু আর রায়াংয়ের মাঝামাঝি ডেলিং-এ রয়েছে কয়লার স্তর। এই কয়লার স্তরের উপর থেকে জল আসছে, তাই জলের রঙ কালচে। তা কালো হক, কালিঝোরা চমৎকার জায়গা। যদি সুযোগ পাও, তাহলে নিশ্চয়ই একদিন গিয়ে দেখে আসবে।

শানুর কাণ্ড

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শানু বলল, "নিন্দে বটে
করছে দেশের লোকরা!
তাদের তো নেই বুদ্ধি ঘটে
আসলে কাঠঠোকরা
খুব সুদৃশ্য পক্ষী। জগাই
পটলা এবং কেষ্ট
যার যা খুশি বলুক গে ছাই,
কাঠঠোকরাই শ্রেষ্ঠ।"

আমি বললুম, "ওহে ছোকরা,
এখন সন্ধ্যাকালে
দেখতে পেলে কাঠঠোকরা
কোন্ সে গাছের ডালে?"
শানু বলল, "সে ওই কালো-
জামের বৃক্ষে রয়।"
বলেই সে যে গাছ দেখাল,
অশথ তারে কয়।

উঠল শানু অশথগাছে
সঙ্গে নিয়ে খাঁচা।
নামতে দেখি, বসে আছে
ক্রুদ্ধ হাঁড়িচাচা
খাঁচার মধ্যে, চিৎকারে তার
কানের পর্দা ফাটে।
এখন ভয়ে-ভয়ে আমার
সমস্ত দিন কাটে।

ছবি: অনুপ রায়

মীনা বন্ধুকে সাহায্য করলো!

দিনে-দুবার নিউট্রামূল খাওয়া অভ্যেস করলে আর ভাবনা থাকে না। এই জন্যেই দেশের হাজার হাজার লোক সব ছেড়ে এখন আমূলের তৈরী শক্তিবর্ধক পানীয় নিউট্রামূল ধরেছেন।

আমূল মিল্কের ঘন ক্রীমের পুষ্টিতে ভরপুর নিউট্রামূলে আছে — আসল কোকো, মল্ট আর চিনি।

আর আশ্চর্য্য! এত গুণ সত্বেও নিউট্রামূলের দাম কম। নিউট্রামূলের

৫০০ গ্রা টিন মাত্র টা. ১১.০০, ট্যাক্স আলাদা।

মীনা এবং আরো অনেকে নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে!

আমূল-এর

নিউট্রামূল

প্রতি কাপ কর পান, হয়ে ওঠো পালোয়ান!

daCunha/N/2c/Ben

হোহো-হিহি

সুব্রত সেনগুপ্ত

লামা বলল, "দিদা কেন ডাকছে আমি এখনই শুনে আসছি। তুই আর ডিং একটু গল্প কর। বাগানেও যেতে পারিস। কিন্তু খবদ্দার, বাগানের পেছনদিকে পুরনো মালীর ঘরটায় ঢুকবি না।"

লামা চলে যেতে ভাবলাম আর কোথাও যাই না যাই, পুরনো মালীর ঘরে একবার যেতেই হবে। ওখানে যেতে কেন বারণ করল? ডিং বলল, "চলো, বাগানে যাই।" বাগানে চমৎকার রোদ এসে গেছে। লামার বোন ডিংয়ের পরনে একটা হলুদ রঙের ফ্রক। রোদও হলুদ রঙের। পুরনো মালীর ঘরের সামনে একটা গাছে বড়-বড় হলুদ ফুল ফুটে আছে। ওখানে যাওয়া বারণ কেন জিজ্ঞেস করতে ডিং বলল, ও জানে না। ডিংরা তো মাত্র কয়েক দিন এখানে এসেছে। আগে এত বড় বাড়িতে শুধু চাকর-বাকর থাকত। আমরাও বাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুধু তাকিয়ে দেখতাম। গোঁফওয়ালা ভোজপুরী দারোয়ানের ভয়ে বাগানেও ঢুকতে সাহস পেতাম না। কিন্তু বাগান-ভর্তি সুন্দর-সুন্দর ফুল।

ডিংকে বললাম, "চলো, মালীর ঘরে যাবে?"

ও বলল, "দিদা যদি জানতে পারে?"

বললাম, "কেউ জানতে পারবে না। দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখব ভেতরে কী আছে, তারপরই চলে আসব।"

দরজা ঠেলতেই প্রথমে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। তারপর ডানা-ঝটপটানির শব্দ। ডিং আমার জামার হাতা আঁকড়ে ধরল। ওকে বললাম, "এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি একটা ইংরেজি ছবিতে দেখেছি, পুরনো বাড়ির দরজা খোলার সময় ওরকম দরজার ক্যাঁচ আর চামচিকে উড়ে যাওয়ার শব্দ হবেই।"

ঘরের ভেতর খুব বেশি আলো নেই। এদিকে একটা হাঁড়ি ওল্টানো, একটা ভাঙা চেয়ার, আর ঘরের মাঝখানে বিরাট একটা সিন্দুক। সিন্দুকের ওপর ওরকম মোটা-মোটা দড়ি কে রাখল? কোনো গুপ্তধনটনের ব্যাপার নাকি?

ডিং বলল, "চলো।"

"দাঁড়াও, যাচ্ছি।" ওকে যাচ্ছি বলতেই মনে হল সিন্দুকের ওপাশ থেকে কে যেন উঁকি মারল। কী সর্বনাশ, এখানে কেউ লুকিয়ে আছে নাকি! কিন্তু এখানে এভাবে কেনই বা কেউ লুকিয়ে আছে? পা টিপে-টিপে সিন্দুকের পেছনে যেতেই একজন না দু'জন যেন ছিটকে বেরুল। কিন্তু কী আশ্চর্য, দরজা খোলাই আছে, তবু ওরা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল না, ঘরের আর-এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল। এবার দেখতে পেলাম, ঠিক আমার আর ডিং-এর মতোই একটা ছেলে আর মেয়ে। ডিং হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কারা?"

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, "কেউ না।"

"কেউ না? সে কী রে বাবা—তোমাদের নাম কী?"

ছেলেটা কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমার নাম চাকু আর ওর নাম ডিং।"

"কক্ষনো না। হতেই পারে না। আমার নাম তো চাকু আর এর নাম ডিং।"

"তাহলে?"

"তাহলে?"

"তাহলে আমার নাম লামা আর ওর কোন নাম নেই।"

"ধ্যাত, আমার বন্ধুর নাম তো লামা। তোমার আসল নাম কী?"

শিশুদের—কিশোরদের—যত ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্‌পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
মহাসংকটে শঙ্কু ৬·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০

বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও মন্মথ চৌধুরী
নিশীত রাতের আহ্বান ৩·০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩·০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেলকি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·০০
মউলির রাত ৫·০০

সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০

সরলাবালা সরকার
পিনকুর ডাইরি ৩·০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সব্যসাচী কথাসাহিত্যিক। একই সঙ্গে তিনি বড়োদের এবং ছোটদের লেখক। বড়োদের লেখাতেও যেমন অসীম খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি, তেমনি ছোটদের লেখাতেও। বিশেষ করে, ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনীগুলি তো তুলনাহীন। গা-ছমছম পরিস্থিতি এবং বুক-ছমছম উৎকণ্ঠা সারা বইতে থাকে ছড়ানো। আর একেবারে শেষে গিয়ে সব রহস্যের এক দারুণ বুদ্ধি-গমগম সমাধান।

এই লেখকের কয়েকটি কিশোর-গ্রন্থ :

পাঁচমুণ্ডির আসর ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
ভয়ের মুখোস ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৫·০০
সত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
হলদে বাড়ির রহস্য ও
দিনে ডাকাতি ৬·০০
সবুজ দ্বীপের রাজা ৫·০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০

সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০

নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ কুস্টাল ১০·০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার বেলক ৪·০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০

অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০

গিরিধারী কুণ্ডু
টংসা চু ৫·০০

সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫·০০

বিমল মিত্র
রাজা হওয়া ঝকমারি ৭·০০

শিশিরকুমার মজুমদার
তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫·০০

অন্নদাশংকর রায়
হৈ রে বাবুই হৈ ৫·০০

মঞ্জিল সেন
ডাকাবুকো ৫·০০

রেবন্ত গোস্বামী
অরুমিতুদের কথা ৪·০০

শিশির কর
গঙ্গায় বাঘ ৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬·০০

"আসল নাম? আসল নাম বলব না। তোমরা যদি হাসো?"

"ও মা, হাসব কেন! বলোই না ছাই।"

"এ কী, ছাই বললে কেন? আমার নাম মোটেই ছাই নয়। আমার নাম হোহো আর ওর নাম হিহি। ছাই আমার মামার নাম।"

ওর কথা শুনে ডিং হিহি করে হেসে উঠল। আর ওকে হাসতে দেখে আমিও হোহো করে হেসে উঠলাম। হোহো বলল "খবদ্দার হাসবে না। তোমরা আমাদের নাম ধরে হাসছ কেন? এই যে বললে হাসবে না?"

"তোমাদের নাম ধরে আবার হাসলাম কখন?"

"হাসলে না? ইশ, মানুষরা কী মিথ্যে কথা বলে! এই তো তুমি হাসার সময় শব্দ হল হোহো আর ও হাসল হিহি।"

তাই তো। সত্যিই তো আমরা হাসার সময় ওরকম শব্দ হয়েছিল। কিন্তু ও কেন বলল, মানুষরা মিথ্যে কথা বলে? ও নিজেও তো নাম বলার সময় মিথ্যে কথা বলেছে। আর ও মানুষ নয়? তবে কী? এই প্রথম আমার কেমন গা-ছমছম করে উঠল। তবু বললাম, "তোমরা মানুষ না তবে কি ভূত?"

আমি কিন্তু সত্যি-সত্যি ওকে ভূত ভেবে কথাটা বলিনি। কিন্তু আমার কথা শুনে হোহো যেন আরও ভয় পেয়ে গেল। বলল, "তাতে কী, তোমাদের তো কোন ক্ষতি করিনি আমরা?" বলতে বলতে হোহো হুহু করে কেঁদে ফেলল। হোহোকে কাঁদতে দেখে হিহিও কাঁদতে লাগল।

কী জ্বালা! ভূত হলে কোথায় আমরা ভয় পাব, না ভূত আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে! এরকম ভূতের কথা কোনদিন শুনিনি তো। ওদের শান্ত করতে বললাম, "কাঁদে না, কাঁদে না, ছোলা-ভাজা দেব।" কিন্তু ছোলাভাজা এখানে কোথায় পাই। তখনই মনে পড়ল তাই তো, আমার পকেটে তো একটা চকোলেট ছিল। দেখি তো আছে কি না? এই তো আছে। চকোলেট বের করে হিহিকে দিতে গেলাম। হিহি হাঁ করে খেতে যেতেই হোহো তাড়াতাড়ি বলল, "না না, আমরা এসব খাই না।"

কী রে বাবা, এরা কোথাকার ভূত! এসব খায় না! আমার কেমন মনে হল হোহো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বললাম, "খাও না, খেতে ভাল লাগবে—খুউব মিষ্টি।"

হোহো বলল, "না বাবা কী খেতে কী খেয়ে মরব না কি?"

কী খেতে কী খেয়ে! বলে কী! আর মরবে কী? আমি জানি মানুষ মরে ভূত হয়। কিন্তু ভূত? ভূতরাও মরে নাকি? জিজ্ঞেস করলাম, "ভূতেরা মরে?"

হোহো গম্ভীরভাবে বলল, "মরে, একশবার মরে। ভূতরা মরে মানুষ হয়।"

"মানুষ মরে ভূত, আবার ভূত মরে মানুষ!" হিহি এই প্রথম কথা বলল, "আমার মামা তো গত বছরে মরে মানুষ হয়েছে।' বলতে বলতে সে তার গাল চাটতে লাগল। তার মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

হিহিকে চকোলেট দিতে যাওয়ার সময় হিহির গালে একটু চকোলেট লেগেছিল। জিজ্ঞেস করলাম, "ভাল লাগছে? মিষ্টি না? আর একটু দেব?"

গম্ভীর হয়ে হোহো বলল, "কী তখন থেকে মিষ্টি মিষ্টি করছ! মিষ্টি কাকে বলে?"

"ও মা, মিষ্টি কাকে বলে কী! চকোলেটটা মিষ্টি, তার মানে খুব ভাল খেতে।"

হোহো বলল, "দেখি।"

ওর মুখের সামনে ধরতে হোহো পুরো চকোলেটটা কচকচ করে খেয়ে ফেলে আবার মুখ বাড়াল, "আরও দাও।"

বললাম, "এখন তো আর নেই, পরে আবার দেব।"

ও জিজ্ঞেস করল, "পরে কখন?"

ডিং বলল, "আমাদের ঘরে চলো। আমার বাক্সে অনেক চকোলেট আছে।"

হোহো বলল, "না বাবা, দরকার নেই।"

ডিং আমাকে বলল, "তাহলে চলো আমরা যাই। লামা হয়তো আমাদের খুঁজছে।"

ওদের ওখানে ওভাবে রেখে আসতে একটুও ভাল লাগছিল না। তবু আসতে হল। যখন চকোলেট খাচ্ছিল, ওদের লম্বা লম্বা জিভ দেখা যাচ্ছিল। ওরা হাত দিয়ে খায় না কেন?

বাইরে এসে দেখি লামা বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে বলল, "এ কী, তোমাদের বারণ করেছিলাম না ঐ ঘরে যেতে? হোহো-হিহিকে তোমরা দেখেছ?"

তার মানে লামা ওদের কথা জানে। বোধহয় আমরা ভয় পেতে পারি ভেবে ওদের কথা বলেনি। এমন কী, ডিংয়ের কাছেও না। বললাম, "ওরা তো খুব ভাল ভূত। তবে একটু ভিতু।"

বলতে-বলতে দেখি হোহো আর হিহি কখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের তো আসতে দেখিনি! ওরা মাটি ফুঁড়ে উঠল, না আকাশ থেকে টুপ-টুপ করে পড়ল? তখন ঘরের মধ্যে আবছা আলোয় ভাল করে লক্ষ করিনি। এখন দেখলাম ওদের মাথা দুটো গোল-গোল। হাত-পা সরু-সরু, লম্বা-লম্বা। বইয়ে ভূতের ছবি যে-রকম দেখেছি, ওদের চেহারা মোটেই সেরকম নয়। নাকী সুরেও কথা বলছে না। গায়ের রঙও কালো নয়, হালকা হলুদ ঘোর ছাই মিশে ওদের গায়ের রঙ। আশ্চর্য, ওদের শরীরের ভেতর দিয়ে ওপাশের সব দেখা যাচ্ছে, যেমন কাঁচের ভেতর দিয়ে সব দেখা যায়। বাগানের একটা ফুল ছিঁড়ে ডিং বলল, "দেখ, কী মিষ্টি গন্ধ?"

হোহো হাত বাড়িয়ে বলল, "চকোলেট, মিষ্টি।"

ডিং বলল, "বললাম তো, চকোলেট ঘরে আছে। ঘরে গেলে দেব।"

আমরা সবাই খাবার-ঘরে গিয়ে বসলাম। ডিং সমস্ত আলমারি খুলে, ড্রয়ার খুলে খুঁজতে লাগল। চকোলেট কোথাও নেই। লামা জিজ্ঞেস করল, "গান শুনবে? দাদা কাল একটা রেকর্ড কিনে দিয়েছে। ভারী মিষ্টি গান।"

হোহো জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

লামা বার করতেই হোহো তার সামনে গিয়ে রেকর্ডটা দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগল। ডিং আর লামা একসঙ্গে হা-হা করে উঠল, "আরে করছ কী, করছ কী!"

হোহো বিরক্ত হয়ে বলল, "মানুষরা এরকম মিথুক হয়। বললে যে ভারী মিষ্টি—কোথা মিষ্টি? চকোলেট রেকর্ডের চাইতে অনেক মিষ্টি।"

আমরা বলতে লাগলাম, "ওমা, রেকর্ড আবার খাবার জিনিস নাকি! ওতে গান হয়। কান দিয়ে শুনতে হয়।"

ভাগ্যিস রেকর্ডটা ভাঙেনি। লামা গ্রামোফোন চালিয়ে দিতে টুং টাং করে খুব সুন্দর একটা বাজনা বাজতে লাগল। এত চমৎকার যে, হোহো পর্যন্ত মাথা দোলাচ্ছে। গান শেষ হতে হিহি আবার একটা কাণ্ড করে বসল। টেবিলের ওপর থেকে ডিংয়ের আনা ফুলটার ওপর বার-বার কান পাততে লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, "ও আবার কী হচ্ছে?"

হিহি মুখ ভার করে বলল, "কই, কিছুই তো শোনা যাচ্ছে না। তখন যে বললে মিষ্টি গন্ধ!"

ডিং হেসে বলল, "গন্ধ কি কানে শোনা যায় নাকি, এই দেখ. এভাবে নাক দিয়ে শুঁকতে হয়।"

হোহো ভীষণ চটে বলল, "তোমাদের মানুষদের নিয়মগুলো তো ভারি গোলমেলে। চকোলেট মিষ্টি, তা মুখ দিয়ে খেয়ে বুঝতে

হবে। গান মিষ্টি, তা কান দিয়ে। আবার গন্ধ মিষ্টি, বুঝতে হবে নাক দিয়ে!"

আমি বললাম, "আরও আছে। ধরো, একটা বাচ্চার মুখ মিষ্টি, তা জানা যাবে শুধু চোখ দিয়ে।"

বিরক্ত হয়ে হোহো বলল, "ধ্যাত, অত আমাদের মনে থাকবে না। আমরা যা পাই জিভ দিয়ে চেখে দেখি, তারপর দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাই।"

ডিং এক টুকরো পাঁউরুটিতে চিনি ছড়িয়ে দিতে দু ভাইবোন মুখ দিয়ে কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগল। ডিং সবাইকে চা এনে দিল। ধোঁয়া উঠছে এরকম গরম চা হোহো আর হিহি জিভ দিয়ে চেটে শেষ করে দিল! আশ্চর্য, ওদের জিভে কি একটুও গরম লাগল না!

হোহো বলল, "ইশ, তোমরা মানুষরা কীরকম মজায় আছ! কতরকম খাবার, যখন যেখানে খুশি যাচ্ছ।"

আমি বললাম, "তোমরা তো আমাদের চাইতেও যখন যেখানে ইচ্ছে যত তাড়াতাড়ি খুশি যতদূরেই হোক যেতে পারো।"

হিহি বলল, "মোটেই না। দিনে তো আমরা চোখে খুব কম দেখতে পাই। রাত্তিরে মানুষরা সব ঘুমিয়ে পড়লে যা একটু বেরতে পারি। আমরা তো এখনও ছোট, উড়তে শিখিনি। তার ওপর মানুষের ভয় তো আছেই।"

ওমা, বলে কী! মানুষের ভয়! মানুষই তো ভূতকে ভয় পায়। রাতে এক-একদিন পড়ার ঘর থেকে বারান্দা পেরিয়ে একা-একা খাবার-ঘরে যেতেই আমার কেমন গা ছমছম করে। এসব কথা অবশ্য ডিং আর লামার সামনে বলা যাবে না। বললেই ওরা এরকম হাসবে যেন ওদের একটুও ভয়টয় নেই। আসলে সবাই মুখে বলে ভূতের ভয় করে না, ভূতটুত কিছু নেই। তারাও মনে মনে ভয় পায়।

এমন কী, বড়রাও। ডিং লামাকে বলল "দিদা জেগে থাকলে ওদের আরও কত কী খেতে দিত।"

লামা বলল, "সত্যি, কিন্তু দিদা যে ঘুমিয়ে আছে।"

হোহো বলল, "তোমাদের দিদা দিনেও ঘুমোচ্ছে, রাতেও ঘুমোয়। মানুষদের কী মজা, ইচ্ছে হলেই ঘুমোয়। আমি কতদিন ঘুমোইনি। হিহিও ঘুমোতে পারে না।"

লামা বলল, "সে কী, তোমরা না ঘুমিয়ে থাকো কী করে? আমার তো অঙ্কের বই খুললেই ঘুম পেয়ে যায়। গ্রামার বই খুললেও। মুড কত রকম, পাস্ট পার্টিসিপ্‌ল কাকে বলে, কিছুতেই মনে থাকে না।"

ডিং জিজ্ঞেস করল, "সত্যি, হিহি, তুমি একদিনও ঘুমোও না? একটুও ঘুম পায় না তোমার?"

হিহি মাথা নাড়ল। হোহো প্রায় কেঁদে বলল, "খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু ঘুমোনো আমাদের বারণ। আর জানো, আমরা যা জানি, যা দেখি একটা কথাও ভুলতে পারি না। সব, সব মনে থাকে। মানুষ হলে আমাদের কত ভাল হত। আমি কেন মানুষ হচ্ছি না?"

হিহি বলল, "খবদ্দার 'মানুষ হব' করবে না। মনে নেই মামা বলেছিল? খুব মানুষ হবার ইচ্ছে করলে আমরা মরে যাব। নয় তো ঘুমিয়ে পড়লেও আমরা মরে মানুষ হয়ে যাব। তুমি মরে গেলে আমি একা থাকব কী করে?"

হিহির চোখে জল। ওদের কষ্ট দেখে আমাদেরও খুব কষ্ট হচ্ছিল। সত্যি ওরা ভূত না হয়ে মানুষ হলে কত ভাল হত। ওরাও আমাদের স্কুলে ভর্তি হত। একসঙ্গে খেলত। ভূত শুনলে আমাদের হেডস্যার কি আর ওদের স্কুলে নিতে রাজি হবেন? ডিং হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের মা কোথায়, মা নেই?"

হিহি কাঁদতে লাগল। হোহো কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "আমাদের মা এখন মানুষ হয়ে আছে। মরছে না, ভূতও হচ্ছে না।"

ডিং বলল, "আমাদেরও মা নেই। বাবা অন্য জায়গায় চাকরি করে। এখানে দিদা শুধু আছে। দিদাকে বলব, দেখো, দিদা তোমাদেরও কত ভালবাসবে।"

লামা বলল, "দাঁড়াও, দিদাকে ডেকে আনছি।" বলেই লামা ছুটে ঘর থেকে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল, তার সঙ্গে তার দিদা। ডিং আর লামার দিদা হোহো-হিহির দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। হোহো আর হিহি লাফিয়ে উঠে 'এই তো আমাদের মা, এই তো আমাদের মা' বলে দিদার দিকে ছুটে গেল। ছুটে গেল, কিন্তু যতই তারা দিদাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চায়, কিছুতেই পারে না। তাদের হাতগুলো হাওয়ার মতো দিদার ওপর দিয়ে চলে যেতে লাগল, ভূতের হাত তো। হোহো চুপ করে দাঁড়াল হঠাৎ। তার মাথার চুল সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখ লাল টকটকে। যেন আপন মনেই কীরকম নাকী সুরে ও বলে উঠল, "ভূত হয়ে আর বাঁচব না। এখনই ছুটে গিয়ে পুরনো কুয়োয় ঝাঁপ দেব। জলের নীচে ঘুমিয়ে পড়লে আবার মানুষ হব।" বলেই হোহো ছুটতে লাগল, তার পেছনে হিহি। দিদা চিৎকার করে উঠলেন, "ওদের থামাও। ওরা সত্যি কথা বলছে। ওরা তোমাদের বড় মামা আর মাসী। তোমাদের মা হওয়ার আগে অল্প বয়সে জলে ডুবে মারা গিয়েছিল।"

আমি, লামা আর ডিং ছুটতে-ছুটতে পুরনো মালীর ঘরে গেলাম। কেউ নেই। তারপর চারপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। কোথায় সেই পুরনো কুয়ো, কোথায় হোহো, কোথায় হিহি? তারা এখনও ভূত হয়ে আছে, না মরে মানুষ হয়েছে, মানুষ হয়ে থাকলে এখন তাদের চেহারা কীরকম হয়েছে, কিছুই জানি না। একবার যদি তাদের সঙ্গে দেখা হত।

ছবি সুধীর মৈত্র

উপন্যাস

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা একটা ভূতুড়ে ছবি দেখতে সিনেমায় গিয়েছিল। ছবি দেখতে বসে সে এক অদ্ভুত মানুষকে দেখল, যে খুশি-মতন মরে যায়, আবার বেঁচে ওঠে। ভয় পেয়েছিল বরদা খুবই। পরে লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল অবশ্য। ভদ্রলোকের নাম সিদ্ধেশ্বর। ওঁর কাজ হল মানুষ নিয়ে গবেষণা। সাধারণ মানুষ নয়, এমন সব মানুষ, যাদের মধ্যে অস্বাভাবিক অলৌকিক কোনো গুণ রয়েছে। দুমকার কাছে সেই গবেষণা-কেন্দ্র।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে নিয়ে এলেন দুমকার সেই রিসার্চ সেন্টারে। সেখানে মহাদেব বলে একটা লোক জুটেছিল, যার সঙ্গে বরদার চেহারায় খুব মিল। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে বিশ্বাস করতেন না। মহাদেবকে তিনি শয়তান বলে মনে করতেন। মহাদেবের উদ্দেশ্য এই রিসার্চ সেন্টার থেকে দু-চার জনকে বাইরে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে টাকাপয়সা কামানো, মানুষকে ঠকানো। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে জব্দ করতে চাইছিলেন। কিন্তু বরদাকে আনার পর নিজেই জব্দ হয়ে গেলেন। তাঁর প্রায় চোখের সামনেই এক টান্ডাওয়ালা খুন হয়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর সন্দেহ করলেন, সুজন বলে একটা লোক, যার গায়ে অসুরের মতন ক্ষমতা, সে মহাদেবের প্ররোচনায় খুন করেছে টান্ডাওয়ালাকে। সন্দেহ করলেন বটে, কিন্তু সুজন কোথায়?

সুজনের খোঁজ চলতে লাগল। কিন্তু এরই মধ্যে মহাদেব এসে বরদাকে শাসিয়ে গেল। বলে গেল, দিন তিনেকের মধ্যে বরদা যদি কলকাতায় ফিরে না যায়, তবে তার অবস্থাও টান্ডাওলার মতন হতে পারে।

ইতিমধ্যে আবার বরদার ঘরে ঢুকে কেউ তার সুটকেস খুলেছিল। শুনে সিদ্ধেশ্বর জানতে চাইলেন, বরদার নোটবইটা আছে কিনা। বরদা নিশ্চিত নয়। আর যদিবা নোটবই থেকেও থাকে তাতেও নিস্তার নেই। সুটকেস থেকে যদি জামাকাপড়ও কিছু সরানো হয়ে থাকে, তাতেও বিপদ। সুজন জামা-কাপড়ের গন্ধ শুঁকে তার মালিককে আক্রমণ করতে পারে। বরদা বড় ভয় পেয়ে গেল। তারপর—

১৩

বরদার ঘরে এলেন সিদ্ধেশ্বর।

মন মেজাজ খারাপ ছিল বরদার। কথাবার্তাও বলছিল না সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে। সে এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে চায়। সিদ্ধেশ্বর যতই বলুন, মহাদেব সুজন কাউকে তার বিশ্বাস নেই। ঘরে আসার সময় বরদা এ-কথাও ভাবছিল যে, মানিককে একটা চিঠি লিখে দেবে কিনা এখানে চলে আসতে। চিঠি বা টেলিগ্রাম কোনোটাই এখান থেকে সরাসরি করা যাবে না। ছুটতে হবে দুমকা। সেটা কি সম্ভব!

ঘরে এসে বরদা খাটের তলা থেকে সুটকেসটা টেনে বার করল। করে বিছানার ওপর রাখল।

সিদ্ধেশ্বর প্রায় পাশেই দাঁড়ালেন। বরদার বিরক্তি, উদ্বেগ আতঙ্ক সবই তিনি বুঝতে পারছিলেন। ঘাঁটাচ্ছিলেন না বরদাকে। বরং নিজেও চুপচাপ কিছু ভাবছিলেন।

সুটকেস খুলে বরদা বলল, "নিন দেখুন।" রাগের মাথায় বলল। দেখার কথা তার, সিদ্ধেশ্বরের নয়।

সিদ্ধেশ্বর শান্ত গলায় বললেন, "আগে নোটবইটা দেখুন। তারপর যা যা আছে একে-একে নামিয়ে, বিছানায় রাখুন।"

বরদা মোটা পুলওভারটা তুলে নিল। ওপরেই ছিল। শীতের কথা ভেবে এনেছিল। তেমন কিছু ঠাণ্ডা এখনও পড়েনি এখানে। পুলওভার ছাড়াই চলে যাচ্ছিল। তা ছাড়া এখানে এসে পর্যন্ত তো ঘরে বসেই দিন কাটছে, গায়ে চড়াবার দরকারও হয়নি।

পুলওভার তুলতেই নোটবইটা পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি তুলে নিল বরদা। "এই তো নোটবই।" বলে পাতা ওলটাতে লাগল।

সিদ্ধেশ্বর বিন্দুমাত্র পুলকিত হলেন না। বললেন, "ভাল কথা। তবে নোটবই থাকলেও যা, না-থাকলেও তাই। মহাদেব যদি আপনার কলকাতার বাড়ির ঠিকানা খুঁজে থাকে, সেটা পেয়ে গেছে। টুকে নিয়েছে অন্য কাগজে। এবার আপনি অন্য সব দেখুন। আপনার কি মনে আছে, সুটকেসে কী-কী ছিল?"

বরদার মতন বেখেয়ালের মানুষের পক্ষে অত মনে রাখার কথা নয়। কলকাতা থেকে আসার সময় সে যে কী নিয়েছিল কেমন করে বলবে। ফর্দ করে তো নেয়নি। বউদি একটা জিনিস নিতে বলে, মা আর-একটা বলে, ঠিক ঠিক যে কী নিয়েছিল সে জানে না। মোটামুটি মনে আছে।

বরদা একটা-একটা করে জিনিস তুলে বিছানার ওপর রাখতে লাগল ঃ বুশ শার্ট, প্যান্ট, পাজামা, গেঞ্জি, জাঙিয়া, দাড়ি কামানোর ব্লেড এক প্যাকেট, এক শিশি লোশান, মাথা ধরার বড়ি কয়েকটা, রুমাল।

সবই তো রয়েছে। বরদা খেয়াল করতে পারল না, কোন্ জিনিসটা নেই। বলল, "আমার কিছু মনে পড়ছে না। সবই রয়েছে দেখছি।"

সিদ্ধেশ্বর এক-নজরে সুটকেসটা দেখছিলেন। জিনিস তাঁর নয়, তিনি কেমন করে বুঝবেন, সুটকেসে কী ছিল, কী-বা খোয়া গিয়েছে।

খানিকটা যেন হতাশই হলেন সিদ্ধেশ্বর; বললেন, "নিন, সুটকেসটা গুছিয়ে ফেলুন।"

বরদা বলল, "মহাদেব কি তাহলে আমার ঠিকানা নিয়ে সরে পড়ল?"

সিদ্ধেশ্বর কোনো জবাব দিলেন না।

বরদা সুটকেস গোছাতে লাগল।

ঘরের চারদিকে অকারণে তাকাতে লাগলেন সিদ্ধেশ্বর। দেখার মতন কিছু নেই। ফাঁকা দেওয়াল, একটা ছোট-মতন দেওয়াল-তাক। একদিকে কাঠের র‍্যাক, জামা-কাপড় ঝুলিয়ে রাখার জন্যে। বরদার পাজামা গেঞ্জি পাঞ্জাবি ঝুলছে।

ঘরের মেঝেতে চোখ পড়ল সিদ্ধেশ্বরের। বরদার দামী মজবুত শু-জুতো রাখা রয়েছে।

চোখ সরিয়েই নিচ্ছিলেন সিদ্ধেশ্বর, হঠাৎ তাঁর কী যেন মনে পড়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর বরদার দিকে তাকালেন। "আপনি মোজা আনেননি?"

বরদা অবাক চোখে তাকাল। "মোজা! হ্যাঁ, মোজা আনব না কেন?"

"ক জোড়া এনেছেন?"

সঙ্গে-সঙ্গে বরদার খেয়াল হল, সে একজোড়া মোজা পরে এসেছিল, আর-এক জোড়া তার সুটকেসে ছিল।। ক্রীম রঙের মোজা, নাইলনের। কিন্তু মোজাটা তো দেখল না সুটকেসে।

হয়ত খেয়াল করেনি; ভুল হয়ে গেছে বরদা দ্রুত হাতে সুটকেস থেকে আবার সব নামিয়ে ফেলল। খুঁজল। মোজা নেই। তাকাল সিদ্ধেশ্বরের দিকে, "আমার একজোড়া মোজা নেই। ক্রীম রঙের।"

সিদ্ধেশ্বর চোখ ফিরিয়ে জুতোর দিকে তাকালেন। "জুতোটা দেখুন তো?"

বরদা সুটকেস ফেলে রেখে জুতোর দিকে গেল। কোমর

জমজমাট মজার আসর

১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!

যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি?

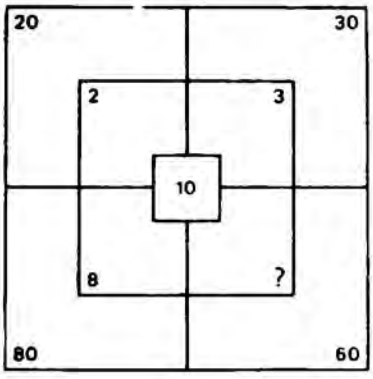

বড় স্পষ্ট হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে। এই ঠিকানায় পাঠাও:

"Fun with Gems"
Dept. C-23,
Post Box No. 56,
Thane 400 601
Maharashtra

উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ:
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

শিগ্‌গীর!

তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি বড় (৩০ গ্রামের) প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।

রঙ-বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস্

CHAITRA-C-193 BEN

নুইয়ে এক পাটি জুতো তুলে নিল। কী আশ্চর্য! তার ক্রীম রঙের মোজা জুতোর মধ্যে গোঁজা।

অন্য পাটিটাও তুলে নিল। সেই একই ব্যাপার। ক্রীম রঙের মোজা-জোড়া ছিল সুটকেসে। সেগুলো জুতোর মধ্যে এল কেমন করে? আর এই জুতোর মধ্যে যে চেক-কাটা মোজা ছিল, যা সে পরে এসেছিল সে-দুটো কোথায়?

বরদা বিহ্বল গলায় বলল, "তাজ্জব ব্যাপার! আমার নতুন মোজা এই জুতোর মধ্যে কে গুঁজে দিয়ে গেছে। আর পুরনো জোড়া নেই।" বলে বরদা ঘরের চারদিকে পুরনো মোজার জন্যে তাকাতে লাগল।

সিদ্ধেশ্বর কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন, "আপনার পুরনো মোজাই চুরি করেছে।"

"পুরনো মোজা! কেন? নতুনটাই বা কেন জুতোর মধ্যে রেখে গেল?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "নতুনটা রেখে গেছে অন্য কারণে। আপনি জুতো পরার সময় অত খেয়াল করবেন না। সাধারণত কেউ করে না। মোজা না থাকলে বরং জুতো পরার সময় খেয়াল হয়, মোজা গেল কোথায়! তাই না?"

বরদা বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। "পুরনো মোজা চুরি করার কারণ?"

"মহাদেবের কাজে লাগবে। প্রথমত মোজাটা আপনি পরেছিলেন। আপনার পায়ের গন্ধ রয়েছে। নতুনটায় না থাকতে পারত।"

বরদা চমকে উঠল। "তার মানে ওই পুরনো মোজা-জোড়া মহাদেব সুজনকে দিয়ে দেবে?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা হেলালেন, "আমার সেই রকম মনে হয়। আপনাকে আমি একটু আগেই বললাম, সুজন রাত্তিরে প্রায় কানা হয়ে থাকে, কিন্তু তখন তার ঘ্রাণশক্তি শিকারী কুকুরের মতন হয়ে ওঠে। সুজন আপনাকে দেখেনি, চেনে না; তবু সে যদি আপনার মোজার গন্ধ শুঁকতে পায়, আপনাকে ঠিক চিনে বার করে নেবে।"

বরদার গা যেন শিউরে উঠল। বিশ্বাস করা মুশকিল। কিন্তু যা-সব কাণ্ড-কারখানা এখানে সে দেখছে, তাতে অবিশ্বাস করা যায় না। হতে পারে সুজন মানুষ হলেও তার মধ্যে কুকুরের এই গুণ রয়েছে। পুলিসরা যে কুকুর পোষে, তাদের কাজই তো হল গন্ধ শুঁকে খুনে বদমাশদের ধরার চেষ্টা। না, অবিশ্বাসের কিছু নেই। সুজন সবই পারে। যে-মানুষ একজন নিরীহ টাঙাওলার ওপর চড়াও হয়ে তার মুণ্ডুটাকেই দুমড়ে ঘাড় ভেঙে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে, তার অসাধ্য কাজ কীই বা থাকতে পারে।

বরদা ব্যাকুল গলায় বলল, "আপনি বলছেন, মহাদেব এইবার সুজনকে আমার পেছনে লেলিয়ে দেবে?"

সিদ্ধেশ্বর কিছু বললেন না। বলার কিছু নেই। মহাদেবকে আর বেশি এগুতে দেওয়া উচিত নয়, সে এখন খেপে গেছে, আবার একটা মানুষ খুন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

বরদা ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। বলল, "আপনি চুপ করে থাকলেই হবে? আমাকে কেন আপনি টেনে আনলেন এখানে?"

সিদ্ধেশ্বর বোবা হয়ে থাকলেন।

বরদা ছটফট করছিল। সুটকেসটা ঠেলে দিল। বলল, "আমি কলকাতায় ফিরে যাব। আপনি ব্যবস্থা করে দিন। ওসব সুজন-টুজন আমি জানি না। আপনি নিজে না পারলে, অন্য লোকজন দিয়ে আমায় রামপুরহাট পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি চলে যাব।"

সিদ্ধেশ্বর এবার কথা বললেন। "আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমরা তো রয়েছি।"

বরদার অসহ্য লাগল। বলল, "আপনারা থেকেও তো এত কাণ্ড হচ্ছে! কী করতে পারছেন আপনি? মহাদেব আপনার নাকের ওপর শয়তানি চালিয়ে যাচ্ছে, কিছুই করতে পারছেন না।...তা আপনাদের ব্যাপার আপনারা সামলান, আমাকে দয়া করে কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে, আর নয়—।"

সিদ্ধেশ্বর বুঝলেন, বরদাকে এখন আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। বললেন, "বেশ, আপনি যদি সত্যিই ফিরে যেতে চান সে-ব্যবস্থা করা যাবে। তবে আপনাকে আমি বলছি, মহাদেবের অত সাধ্য হবে না যে, এখানে বসে সে আপনার ক্ষতি করবে!"

"করছে, তবু বলছেন তার সাধ্য হবে না!"

"না, মহাদেব এখন পর্যন্ত আপনার কোনো ক্ষতি করেনি। আপনাকে সে সাবধান করছে, ভয় দেখাচ্ছে। ক্ষতি করার ফন্দি আঁটছে অবশ্য, কিন্তু পারবে না।...থাকগে, আমি সতীশের কাছে যাচ্ছি। আপনি যদি যেতে চান চলুন।"

বরদার কোনো আগ্রহ হল না। বলল, "আপনি যান।"

"সতীশের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতাম।"

মাথা নাড়ল বরদা। সে যাবে না।

সিদ্ধেশ্বর চলে গেলেন।

বরদা সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বসে পড়ল বিছানায়। না, আর এক মুহূর্তও তার এখানে থাকার ইচ্ছে

নেই। কলকাতাতেই সে ফিরে যেতে চায়। মানিক ঠিকই বলেছিল, বলেছিল, "তুই যাস না বরদা, ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবি।" ঠিকই বলেছিল।

দুপুর কাটল। বিকেলও কেটে গেল। বরদা ঘরে বসে-বসেই সময় কাটাল। কখনও বই পড়ার চেষ্টা করল, কখনও চুপচাপ শুধু শুয়ে থাকল, ভাবল। বিকেল পড়ে যাবার পর সে বাইরে এসে পায়চারি করল খানিকক্ষণ। একটা ব্যাপার দেখে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। পি পি রিসার্চ সেণ্টারের মধ্যে এত বড় একটা বিপদ, অথচ কারও যেন মাথাব্যথা নেই, ভয় নেই, যে যার মতন কাজকর্ম করছে, ঘুরছে ফিরছে। মহাদেব কিংবা সুজনকে নিয়ে ওদের ভাবনা-চিন্তা না হবার কারণ কী?

বিকেল শেষ হবার মুখে মুখেই একজন এসে বরদাকে খবর দিল, সিদ্ধেশ্বর তাকে ডাকছেন।

বরদা বলতে যাচ্ছিল, সে যাবে না। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে বলল, "আসছি।"

লোকটা চলে গেল।

বরদা ঘরে ঢুকে সুটকেসে চাবি দিল। কাল চাবি দেওয়া ছিল না। দরকার হত না চাবি দেবার। বাইরে এসে দরজায় তালা দিল। পলকা শস্তা তালা। থাকা না-থাকা সমান। কাল তো তালা দেওয়াই ছিল। তবু তার ঘরে লোক ঢুকেছিল কত সহজে।

মাঠ বাগান পেরিয়ে বরদা সিদ্ধেশ্বরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরে সিদ্ধেশ্বর একা ছিলেন না; সতীশ ডাক্তারও ছিল।

বরদা আসা মাত্রই সিদ্ধেশ্বর স্বাভাবিক গলায় বললেন, "আসুন। আপনার সঙ্গে সতীশের আলাপ করিয়ে দিই।"

আলাপ হল। সতীশকে খারাপ লাগার কথা নয়, একটু বেশি কথা বলে, গলার স্বর মোটা, গম্ভীর, কিন্তু শুনতে ভাল লাগে। চোখ দুটো ভীষণ ঝকঝকে। তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন কিসের এক আকর্ষণে টেনে নিচ্ছে।

সন্ধে হয়ে গেল। বাতি জ্বালিয়ে নিলেন সিদ্ধেশ্বর।

সিদ্ধেশ্বরই বললেন হঠাৎ, "বরদাবাবু, আপনি কলকাতায় যাবেন বলছিলেন। কাল যদি আপনাকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করি, কেমন হয়!"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের চোখে চোখে তাকাল। "কখন?"

"সকালের দিকে হবে না। রাত্তিরে একটা গাড়ি রয়েছে।"

"রাত্তিরে?"

"সতীশ আপনাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। ও আজ থেকে গেল, কাল সকালে ফিরে যাবে বলছিল, আমি আটকে রাখলাম।"

বরদা ঘাড় ফিরিয়ে সতীশের দিকে তাকাল। সতীশ কিসের একটা কাগজ দেখছে।

বরদা আবার সিদ্ধেশ্বরের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। "রাত্তিরে কেন?"

সিদ্ধেশ্বর সরাসরি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, বললেন, "আপনি সতীশের মোটর-বাইকের পেছনে বসে চলে যাবেন। বেশি সময় লাগবে না।"

বরদার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। সিদ্ধেশ্বর যেন জেনেশুনে বুঝে তাকে রাত্রে পাঠাতে চাইছেন। বলল, "রাত্তিরে যাওয়া কি নিরাপদ হবে?"

"সুজনের কথা ভেবে বলছেন?"

বরদা কোনো জবাব দিল না।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সুজন মোটর-বাইকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারবে না—" বলে একটু যেন হাসলেন, "সতীশ ভাল মোটর-বাইক চালায়, ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল..." কথাটা শেষও করলেন না সিদ্ধেশ্বর।

সতীশ এবার বরদার দিকে তাকাল। বলল, "আপনাকে আমি পৌঁছে দেব। ভাববেন না। আমার অনেক লোক আছে স্টেশনে। গাড়িতে তুলে দেবে আপনাকে।"

এমন সময় একটা লোক চা নিয়ে এল।

সতীশ, সিদ্ধেশ্বর, বরদা চা নিল।

লোকটা চলে যাচ্ছিল। সিদ্ধেশ্বর তাকে ডাকলেন, "যশোদা কোথায়? তাকে একবার পাঠিয়ে দাও।"

লোকটা চলে গেল।

চা খেতে-খেতে সিদ্ধেশ্বর সতীশকে বললেন, "সতীশ, যশোদাকে দিয়ে তুমি ও-কাজটা করতে পারো।"

সতীশ একটু ভাবল। "যশোদা পারবে?"

"আমার মনে হয় পারবে।"

"মহাদেব কি তাকে বিশ্বাস করবে?"

"মহাদেব কাউকেই বিশ্বাস করবে না। তবু তাকে যে-কোনো ভাবে ওষুধটা খাওয়াতে হবে। যশোদা মহাদেবের পাশের ঘরে থাকে, তার ফন্দিফিকির জানা আছে অনেক। ওকে দিয়েই চেষ্টা করো।"

বরদা কিছুই বুঝতে পারছিল না কথাবার্তার। তার আড়ালে সিদ্ধেশ্বররা কী যে পরামর্শ করেছেন কে জানে। কিন্তু বরদা এটা বুঝতে পারছিল, মহাদেবকে আর বেশি বাড়াবাড়ি করতে দিতে চান না সিদ্ধেশ্বর।

বরদা বলল সিদ্ধেশ্বরকে, "পরে আমি কলকাতা যাবার সময় আপনি কোথায় থাকবেন?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কাছাকাছি থাকব আপনার। ভয় নেই।" (ক্রমশ)

ছবি: মদন সরকার

এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার
বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নের সঙ্গে
EXHAUSTIVE
QUESTIONS এ দেওয়া
প্রশ্নগুলি মিলিয়ে নিলে বোঝা যাবে
এ বইয়ের সার্থকতা কোথায়!

১৯৭৯ সালের পরীক্ষার্থীদের বই এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। দাম ১৫ টাকা। পুরো টাকা M.O. করলে রেজিস্ট্রী ডাকে বই পাঠানো হয়। অবশ্য বই ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই টাকা আসা চাই।

B. B. KUNDU & SONS
12L, TAMER LANE, CALCUTTA-700 009

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ১১ ॥

'আনন্দমেলার' মাসিক কিস্তিটা তৈরি করার জন্য কলম নিয়ে বসেছি। মনটা খুব ভাল ছিল না। কয়েকদিন আগেই তো দূরপ্রাচ্য সফর সেরে ফিরে এসেছি। গিয়েছিলুম মোহনবাগান টিম নিয়ে। ঠিক ফেডারেশন কাপের খেলা শেষ হবার পরেই। ভাবছিলুম বাইশ বছর আগের দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে এখনকার দূরপ্রাচ্যের কত তফাত। খেলাতেও ওই অঞ্চলের দেশগুলি কত এগিয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কী, ১৯৫৬ সনে খেলোয়াড় হিসাবে আমার প্রথম দূরপ্রাচ্য সফরের সময় ছিল এক চিন্তা, এখন অন্য চিন্তা। তখন আমার উঠতি খেলোয়াড়-জীবন। চিন্তা ছিল ভাল খেলতে পারব কিনা। আমার খেলা দেখে ক্লাবের কর্মকর্তারা খুশি হবেন কিনা। ইন্দোনেশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের ফুটবল-মান ও টেকনিক-ট্যাকটিকস ভাল করে খতিয়ে দেখার মতো চোখ ও মন তখন ছিল না। নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত ছিলুম। আর এখন মোহনবাগানের ম্যানেজার হয়ে গেলেও ওই সব দেশের সঙ্গে মোহনবাগান কেমন খেলছে শুধু সেটাই বিচার করিনি। মোহনবাগানের স্বার্থের দিকে নজর রেখেও চিন্তা করেছি আমাদের দেশের ফুটবল-মানের কথা। বলতে আমার একটুও দ্বিধা নেই যে, ফুটবলে দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি সত্যিই অনেক এগিয়ে গেছে। এবং একটুও কুণ্ঠা না রেখে বলছি, আমার ক্লাবের সামগ্রিক খেলায় আমি খুশি হতে পারিনি। মনটা খারাপ ছিল ওই জন্যই।

এই চিন্তার মধ্যেই পেলুম দারুণ এক দুঃখের খবর। বেঙ্কটেশদা আর নেই। মাত্র একান্ন বছর বয়সে হৃদরোগে মারা গেছেন। মনের উপর একে-একে তাঁর অনেক ছবি ভেসে উঠতে আরম্ভ করল। অনেকগুলি ছবি তাঁর ফুটবল খেলার শৌর্য ও সৌন্দর্যের, অনেকগুলি তাঁর সুন্দর ব্যবহারের আর কিছু তাঁর রসিকতা ও চুটকি কথার।

কত বড় খেলোয়াড় ছিলেন বেঙ্কটেশদা—তোমরা যারা তাঁর খেলা দেখনি, কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু অত বড় খেলোয়াড় বলেই নয়, কিংবা রাইটআউটের খেলায় নতুন ধারার প্রবর্তনা বা আক্রমণে নতুন বিন্যাস আনার জন্যও ঠিক নয়, নানা কারণে আমাদের সঙ্গে তাঁর এক মধুর আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাঙ্গালোর থেকে খেলতে এসে এই বাংলাতেই ঘর বেঁধেছিলেন। বিয়ে করেছিলেন আমাদেরই এক বাঙালি বোনকে। তাই তাঁর বিয়োগব্যথা বেশি করে বুকে বেজেছে। রোজই প্রায় দেখা হত। খেলার মাঠ ছাড়া থাকতে পারতেন না। মারাও গেলেন একরকম খেলার মাঠেই। তোমাদের মতো ছোট ছেলেদের খেলা দেখতে-দেখতে।

এবার দূরপ্রাচ্য সফরে যাবার ক'দিন আগে, আমরা ভেটারেন্‌সরা খড়্গপুরে একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলুম। আমি বারবার বল বাড়িয়ে দিচ্ছিলুম বেঙ্কটেশদার দিকে, তাঁর সেই পুরনো দিনের দক্ষতার একটু ছাপ দেখার আশায়। একটু পরিশ্রান্ত হবার পর তিনি ছুটে এসে বললেন, "এই আমাকে আর বল দিবি না। দেখছিস না আমার পেটের মধ্যেই একটা বল লুকিয়ে আছে। আমি আর পারছি না। তুই যখন খেলা আরম্ভ করেছিলি তখনই তো আমি রিটায়ার করার মুখে। তখনো জ্বালিয়েছিস, এখানে জ্বালাচ্ছিস।"

আমি হেসে উঠলুম। খেলার শখ ছিল খুবই, কিন্তু বেশিক্ষণ খেলতে পারতেন না। শরীরটা ভারী হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে অসুবিধা হত ভুঁড়ি নিয়ে। ওই ভুঁড়ির জন্যই বলতেন, "আমাকে বেশি বল দিবি না, আমার কাছেই একটা বল লুকনো আছে। ছয় নম্বরেরও বলতে পারিস।"

অথচ আজ মনে পড়ছে, ওই বলের ব্যাপারেই বেঙ্কটেশদা আমাকে একদিন প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনা করেছিলেন। অবশ্যই রসিকতা সহযোগে। সেটা ১৯৫৫ সনের কথা, সেবার আমরা প্রথম রোভার্স কাপ জিতি। এবং রোভার্সেরই খেলার ঘটনা। সেমিফাইনালে বোম্বাইয়ের ক্যালটেক্স দলের সঙ্গে চারদিন ধরে হাড্ডাহাড্ডি খেলার কথা তো এর আগেই লিখেছি। তৃতীয় দিন ক্যালটেক্স যখন ১—০ গোলে এগিয়ে এবং আমাদের পরাজয়ের আশঙ্কা, তখন হঠাৎ এক সময়ে একটা উঁচু বল এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার একটু আগে ছিলেন বেঙ্কটেশদা। ভলি মারার জন্য আমি প্রস্তুত হচ্ছি এবং 'লীভ ইট' বলে এগিয়েও গেছি, কিন্তু তার আগেই বেঙ্কটেশদা ভলি মেরে দিলেন। বলটি ক্রসবারের একটু উপর দিয়ে চলে গেল। শট ভাল হয়েছিল, কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল, আমি মারলে নিশ্চয়ই গোল হত। হয়তো না-হতেও পারত, আমি শুধু ধারণার কথাই বলছি। তাছাড়া ভলির সুযোগ পেলে আমার আনন্দ হত। আর-একটা ধারণা হয়েছিল, বেঙ্কটেশদার চেয়ে আমি ভাল পজিশনে ছিলুম। তাই বেঙ্কটেশদা অত বড় খেলোয়াড় এবং অনেক সিনিয়র খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আমি বলেছিলুম, "বলটা কি আমার ছিল না?" মৃদু ভর্ৎসনা করে বেঙ্কটেশদা বলে উঠলেন, "সে কী রে! এ আবার কী কথা? বলটা বিশেষ করে কারও নয় মাঠের বাইশজনেরই।"

বেঙ্কটেশদার কথায় একটু লজ্জা পেয়েছিলুম। তিনিই কিন্তু

হকেরে, ডিনার টেবিলে (একেবারে বাঁ দিকে চুনী)

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের
হাসিখুসি প্রথম ভাগের মতই প্রকাশিত হল
নতুন পারুমাজে, নতুন রঙীন ছবিতে
হাসিখুসি দ্বিতীয় ভাগ—২.৫০
মনোলোভা ছড়ার নতুন রূপ—ছড়া পড়তে গিয়ে
অজান্তে শিখে ফেলবে যুক্তাক্ষর যেমনঃ

"মস্ত হলেন ব্যাঘ্র মশাই গ্রামের মাঝে এসে" অথবা "শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বিনে হল বিশ্বনাথ"

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের আরো বইঃ
হাসিখুসি প্রথম ভাগ ২.৫০
হাসিরাশি ৪.০০
আষাঢ়ে স্বপ্ন অথবা জানোয়ারের মেলা ৩.০০
ছোটদের রামায়ণ — ২.৫০
ছোটদের মহাভারত — ৪.০০
* *
কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা
কুমির সাহেব — ৩.০০
বিনু ও কুমির-সাহেবের সংস্কৃত ও সন্ধি
যেমন ছড়া তেমন ছবি

সিগ্ধ সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড
৩২-এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯

তৃতীয় দিন আমাদের হার বাঁচিয়েছিলেন তিরিশ সেকেণ্ড আগে গোলটি শোধ করে এবং তাঁরই গোলে চতুর্থ দিনে জিতে আমরা ফাইনালে উঠেছিলুম, এবং শেষ পর্যন্ত রোভার্স কাপ জিতেছিলুম। সেবার দারুণ খেলেছিলেন বেঙ্কটেশদা। বলাইদা বলেছিলেন, "আমার সবাই পদ্ম। তার মধ্যে উত্তম বলেই ও পদ্মোত্তম।" পুরো নাম ছিল পদ্মোত্তম বেঙ্কটেশ।

আজ কিন্তু আমার বেশি করে মনে পড়ছে প্রথম ডিভিশনে আমার প্রথম দিনের খেলার কথা। ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে ওই খেলায় বেঙ্কটেশদাই আমাকে লেফট ইন্ থেকে ডেকে রাইট ইনে এনেছিলেন তাঁর পাশে খেলার জন্য। যেভাবে আগলে রেখে আমাকে খেলিয়েছিলেন, চামচে করে মুখে খাবার দেবার মতো পায়ের সামনে বল জুগিয়েছিলেন, ঠিক সময়টিতে বল চেয়ে নিয়েছিলেন, এক কথায় বলব—একজন সিনিয়র খেলোয়াড়ের কাছ থেকে একজন জুনিয়র খেলোয়াড় ওর চেয়ে বেশি দরদ, ওর চেয়ে বেশি সাহায্য ও অনুপ্রেরণা পেতে পারে না।

অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী ছিলেন। কথা বলতেন খুবই কম। মাঠে কিন্তু তাঁর প্রতিটি মুভমেন্ট কথা বলত। দুই পায়েই ছিল দুর্দান্ত শট। রাইট আউটের খেলোয়াড়। বেশি গোল পেয়েছেন কিন্তু বাঁ-পায়ে। হরিণের মত ছুটে, ধনুকের মত সেণ্টার না করে বিপক্ষ ডিফেন্সকে টালমাটাল করে ডানদিকে টেনে নিতেন। তারপর কাটিং করে ছুটে আসতেন বাঁ দিকে। ছুটন্ত বলে শট নিতেন পেনাল্টি বক্সের উপর থেকে। বেশি সময় বাঁ পায়ে, কখনো ডান পায়ে। সাত-আট রকমের ড্রজ ছিল তাঁর। আবার তাঁর সোয়ার্ভ শট যে কীভাবে বাঁক নেবে, তার হদিশ পেতেন না নামী গোলকীপারও। গতির যেটুকু ঘাটতি ছিল, বেঙ্কটেশ সেটা পুষিয়ে নিতেন পায়ের জাদুতে। যেমন লেফট আউটে সালে, তেমনি রাইট আউটের খেলার ধারা বেঙ্কটেশ একেবারে পাল্টে দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালের পি কে, সুকুমার সমাজপতি, এখনকার সুরজিৎ সেনগুপ্ত সেই ধারারই উত্তরসূরী। রাইট আউট হিসাবে ভারতে বেঙ্কটেশদার জুড়ি ছিল না। স্থান ছিল এক নম্বরে। সেই বেঙ্কটেশদা এত কম বয়সে চলে গেলেন। মৃত্যু যে কার কখন কীভাবে আসে কেউ বলতে পারে না।

আবার দূরপ্রাচ্য সফরের কথায় ফিরে আসি। সুমাত্রা দ্বীপ থেকে সিঙ্গাপুরে এসে এবার আর আমরা ক্যাথে প্যাসিফিক হোটেলে না উঠে উঠলুম ইস্ট এশিয়া হোটেলে। এ-হোটেলটিও সুন্দর এবং এয়ার কণ্ডিশন্ড। তবে ক্যাথে প্যাসিফিকের মতো বিশাল এবং বিলাসবহুল নয়। সিঙ্গাপুর আগে ছিল ব্রিটিশ কলোনি। সবই কলকাতার মতো। গাড়ি চলে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে, 'কীপ টু দা লেফট'-এর নিয়মে। ইন্দোনেশিয়ার ভাষা ছিল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয়। সিঙ্গাপুরে আলাপের মাধ্যম ইংরেজি। শহরটি তখনই ছিল মনোরম। আর সেদিন দেখে এলুম, পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর শহরগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে। চারদিকে সমুদ্রের অগাধ জলরাশির উপর যেন ভাসমান স্বপ্নপুরী।

সিঙ্গাপুরকে দূরপ্রাচ্যের সিংহদ্বারও বলা যেতে পারে। টোকিওর দিকেই যাও, আর ইন্দোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়ার দিকেই যাও, সিঙ্গাপুর ছুঁয়ে যেতে হবে। সুতরাং এখানকার আধবাসীরা প্রচুর ভাল ফুটবল খেলা দেখে থাকে। নানা দেশের দল মাঝে-মাঝে সফরে আসে তো। সম্ভবত ওই কারণে ১৯৫৬ সনে ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের খেলার প্রশংসা সিঙ্গাপুরের পত্র-পত্রিকায়ও ফলাও করে প্রকাশ করা হলেও সাধারণের মধ্যে প্রথমে খুব একটা উৎসাহ লক্ষ করিনি। হাজার হলেও আমরা তো ছিলুম একটা ক্লাবসাইড। অবশ্য ভারতীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে

মোহনবাগান নামের সঙ্গে যাঁদের মন জড়িয়ে আছে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জেগেছিল।

সিঙ্গাপুরে পৌঁছে একটু পরেই আমরা গেলুম জালানবাসর নামে একটি জায়গায়। খেলা হবে সেখানেই। স্টেডিয়ামটির নামও জালানবাসর স্টেডিয়াম। তখনই একেবারে আধুনিক কেতায় সাজানো। ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা। সবুজ গালিচার মত মাঠ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওইদিনই ফ্লাড লাইটে যখন আমরা প্র্যাকটিস করলুম, তখন অনেকের মধ্যে নতুন অনুভূতি। ফ্লাডলাইটে আমাদের অনেকেরই ওই প্রথম প্র্যাকটিস। মান্নাদা প্রভৃতি যাঁরা ১৯৫৪ সনে ম্যানিলায় এশিয়ান গেমসে খেলে এসেছিলেন, তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

আমাদের প্রথম খেলা ছিল সিনো-ইণ্ডিয়ান দলের সঙ্গে। অর্থাৎ চীনা - ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দলের বিরুদ্ধে। খেলা আরম্ভের আগেই কিন্তু দেখলুম গ্যালারির কোন আসনই খালি নেই। কানায়-কানায় দর্শকে ভরে গেছে। মিষ্টি সুরে মাইকে গান বাজছে। মাঠ এবং পরিবেশ ভাল-ফুটবলের যথেষ্ট অনুকূল। আমরা সংকল্পও করে নিয়েছিলুম যে, জিতবই। জিতেছিলুম ৪—১ গোলে। পি কে বদরু ব্যানার্জি, কেষ্ট পাল, আমি ও রামন—এই পাঁচজন ফরোয়ার্ড বল দেওয়া-নেওয়া করে খেলে সিনো-ইণ্ডিয়ান ডিফেন্সে বার-বার ফাটল সৃষ্টি করেছিলুম। শুধু রামন বাদে আমরা চারজনই একটি করে গোল করেছিলুম। পরের দিন কাগজে বড় বড় শিরোনামায় আমাদের খেলার প্রশংসা করা হলেও মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হল—পরের ম্যাচে সিনো-মালয় দলকে হারাতে হলে মোহনবাগানকে অনেক ভাল খেলতে হবে।

সিনো-মালয় দল ছিল সত্যিই শক্তিশালী। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের আগে নাকি দলটি কারো কাছেই হারেনি। যুদ্ধের পর হেরেছে শুধু দুটি খেলায়। একবার অস্ট্রিয়ার 'কালমা ক্লাবে'র কাছে। আর একবার ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দলের কাছে। সুতরাং আমাদের চিন্তার কারণ ছিল। খেলাও হল আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণে দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ। এ-খেলাতেও আমরা জিতলুম ৩-২ গোলে। শুরুতে ছিল আমাদের আধিপত্য। পর-পর তিনটি গোল করেন পি কে, কে পাল ও বদরু ব্যানার্জি। ওঁরা একটি গোল শোধ করায় বিরতির সময়ে ফল থাকে ৩—১। ওরা প্রথমেই তিনটি গোল খেল কেন? আমাদের ফরোয়ার্ডদের মধ্যে যোগাযোগ এমন দানা বেঁধে উঠেছিল যে, প্রথমে সিনো-মালয় দল আক্রমণ ও গতির মোকাবিলা করতে পারেনি। কিন্তু একটু সামলে নেবার পর ওরা এমনভাবে পাল্টা আক্রমণ হানতে আরম্ভ করল যে, আমাদের ডিফেন্সের ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম। বিরতির পর পুরো পনেরো মিনিট ওরা একের-পর-এক আক্রমণ চালিয়ে গেল। অবরোধমুক্ত হয়ে আমরাও আবার ওদের রক্ষণ-ব্যূহে হানা দিতে আরম্ভ করলুম। স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে উঠছে ঘন-ঘন করতালিতে। বদরু ব্যানার্জির একটি শট বারে লেগে ও কে পালের একটি শট পোস্টে লেগে ফিরে এল। আমি আর রামন ওদের খেলোয়াড়দের কাটিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে গিয়ে কয়েকবার বিপদের সৃষ্টি করলুম। কিন্তু কিছুতেই আর গোল পেলুম না। উল্টে শেষ দিকে মরণ কামড় দিয়ে ওরা আর-একটি গোল শোধ করে দিল। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে আমাদের জয়ের পর প্রবাসী ভারতীয়দের জয়ধ্বনিতে স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে উঠল। পরের দিন কাগজে আমাদের খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হল।

সিঙ্গাপুরে তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ ছিল ওখানকার সম্মিলিত দলের সঙ্গে। নাম এস-এ-এফ-এ। এ দলে ছিলেন সিঙ্গাপুরে অবস্থানকারী কয়েকজন ব্রিটিশ প্রোফেশনাল খেলোয়াড়। দলটি

গোল দিয়ে ফিরে আসছেন চুনী

দারুণ শক্তিশালী। অপরদিকে পি-কে, শুভাশিস্ গুহ ও গোলরক্ষক এস চ্যাটার্জির চোট-আঘাত থাকায় আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম। আগের দুটি খেলায় আমাদের জয়ের ফলে এ খেলাটি দেখার জন্য সারা সিঙ্গাপুর পাগল হয়ে উঠেছিল। সাধ্যমত চেষ্টা করেও আমরা সিঙ্গাপুরের শেষ ম্যাচ জিততে পারিনি। ১-২ গোলে হেরে গিয়েছিলুম। রামনের দুটি এবং আমার একটি শট যদি পোস্টে লেগে ফিরে না আসত, তবে ফল অন্যরকম হতে পারত। কিংবা খেলা ড্র তো হতই, যদি শেষ সময়ে পি কে'র শট পোস্টে প্রতিহত না হত। ওটি ছিল ভয়ংকর এক শট।

এবার হংকং সফর। বিপুল এক বিমান রাত বারোটায় সিঙ্গাপুর থেকে আমাদের নিয়ে হংকংয়ের দিকে উড়তে আরম্ভ করল। শুনলুম সমুদ্র আর পাহাড়ের উপর দিয়ে বিমান ছুটছে ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে এবং সমুদ্র স্তর থেকে উনিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে। রাতের অন্ধকারে আর তন্দ্রার ঘোরে অনেক কিছুই আমাদের চোখের আড়ালে থেকে গিয়েছিল। পুবের আকাশ ফরসা হতেই দৃশ্যপট বদলে গেল। সূর্যদেব মুখ তুলছেন সমুদ্রের গভীর জলের মধ্য থেকে। একবার ভাবলুম, আমরা তো আকাশ দিয়েই যাচ্ছি, এই গতিতে চললে কতক্ষণে পৌঁছনো যাবে ওই সোনার থালাটার কাছে, যার দ্যুতি হালকা কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে রঙ ছড়াচ্ছিল সমুদ্রের নীল জলে আর ধূসর পাহাড়ের গায়ে।

পৃথিবীর বিখ্যাত ও সুন্দর বিমানবন্দরগুলির মধ্যে হংকং অন্যতম। পাহাড় কেটে তৈরি ছোট শহরটিও মনোরম। তিনদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, এক দিকে খাড়াই পাহাড়। বিমান বন্দরের রানওয়ে তেমন দীর্ঘ নয়। এই কারণে মাঝে-মাঝে এখানে বিমান দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। হালকা কুয়াশা দেখেই বিমান-কর্মীরা ওই কথা আলোচনা করেছিলেন। শুনে আমাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এবং ক'দিন পরে সত্যি-সত্যিই কৌলুনে এক শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনায় আমাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল হংকং থেকে কলকাতায় ফেরার আগের দিন। তারিখটি ছিল ২২শে মার্চ। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে একটি মিলিটারি জেট প্লেন ভেঙে পড়েছিল। নিজেদের চোখেই দেখে-ছিলুম সেই ধ্বংসলীলা। ভাবতে পারো, ফেরার দিন আমাদের মনের অবস্থা কেমন ছিল?

বাবার কথা মনে পড়ে গেল। সেই টুইন সিটি কৌলুন-হংকং। ঠিক হাওড়া-কলকাতার মতো। এখানে মাঝখানে গঙ্গা, ওখানে সমুদ্রের অববাহিকা। কৌলুনেই বিমান নামল। ফেরি স্টিমারে সমুদ্র পার হয়ে আমরা হংকংয়ে পৌঁছলুম।

হংকংয়ে চীনাদেরই আধিপত্য। অ্যাংলো-চীনা এবং ইংরেজও প্রচুর। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেশির ভাগই শিখ। প্রথম শ্রেণীর যে হোটেলটিতে উঠেছিলুম তার নাম "উইনার হাউস"। নামটি আমাদের মনে ধরল। ভাবলুম এখানেও আমরা উইনার

হব, যদিও ১৯৫১ ও ১৯৫৪ সনে হংকংয়ে ভারতীয় দলের ব্যর্থতার কারণে মনে আমাদের ভয় ছিল। সে-দলের অধিনায়কও ছিলেন মান্নাদা।

হংকংয়ে ফুটবল দারুণ জনপ্রিয় খেলা। বিশেষ করে চীনাদের মধ্যে। দেখলুম যেখানেই একটু ফাঁকা জায়গা আছে সেখানেই চীনা ছেলেরা বল পেটাপেটি করছে। তাদের পায়ের ছোট-ছোট কাজ এবং খেলার কলা-কৌশলও দেখার মতো। বল কিন্তু চামড়ার বা রবারের নয়। টেনিস বলও নয়—বেত দিয়ে তৈরি ফাঁপা বল। তাতেই চীনা জাগ্‌লারি দেখাবার চেষ্টা। বেতের একটি বল আমি নিয়ে এসেছিলুম। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কাছে রেখে দিয়েছি।

হংকংয়ে আমাদের প্রথম ম্যাচ ছিল অল হংকং দলের সঙ্গে। শুনলুম দলটি খুবই শক্তিশালী। কিন্তু গভর্নমেণ্ট স্টেডিয়ামে ৯০ মিনিটের খেলায় অল হংকংকে আমরা নাস্তানাবুদ করে জিতেছিলুম ৬—২ গোলে। বিরতির সময়েই ৫—০ গোলে এগিয়ে ছিলুম। দ্বিতীয়ার্ধে ওরা তেড়েফুঁড়ে খেলে দুটি গোল শোধ করার পর আমরা আর একটি গোল করি। ওদের একটি গোল হয়েছিল পেনাল্টি কিক থেকে। মিডান ও সিঙ্গাপুর সফরের সাফল্যে আমাদের দলটির মধ্যে এমন সুন্দর বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল যে, মাখনের মধ্য দিয়ে ছুরি চালাবার মতো প্রথমার্ধে ওদের ডিফেন্সকে আমরা একেবারে ফালফালা করে ফেলেছিলুম। ভারতীয় সমর্থকদের আনন্দ আর ধরে না। শুনলুম এশিয়ার কোনও দেশের দলের কাছে অল হংকং আগে এভাবে পর্যুদস্ত হয়নি। আমার নিজের খেলায় নিজে খুশি হলেও কিন্তু কোন গোল করতে পারিনি। পরের দিন সমস্ত সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় আমাদের খেলার প্রশংসা। কোনও কাগজ ইংরেজিতে যা লিখলেন তার বাংলা অর্থ : "মোহনবাগানের হাতে হংকংয়ের নিধন।" কোনও কাগজে লেখা হল : "হংকং নাস্তানাবুদ ও পর্যুদস্ত।" কেউ লিখলেন : "মোহনবাগানের মনমাতানো খেলা।" অনেক কাগজে আমাদের প্রত্যেকের ছবি ছাপা হল। কয়েকটি কাগজে আমার, পি কে'র ও কেষ্ট পালের উপর লেখা হল বিশেষ নিবন্ধ। ইংরেজ ও চীনা খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া সম্মিলিত হংকং একাদশের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলার আগেই সত্তারদা কলকাতা থেকে ফিরে এলেন। সঙ্গে চন্দন সিং, পরিমল মজুমদার ও দুলাল মুখার্জি। আমাদের মনোবল আরও বেড়ে গেল। এতদিনে আমি নিজের পজিশনটি পাকা করে নিয়েছি। অপর ইনে কে খেলবেন? সত্তার, না বদরু ব্যানার্জি তাই নিয়ে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যাই হোক খেলার দিন সকালেই দেখি 'উইনার হাউস' হোটেলের সামনে প্রচুর ভিড়, চীনাদের ছোট-ছোট জটলা। ব্যাপার কী? শুনলুম, প্রথম ম্যাচে আমরা হেরে যাব এই বাজি ধরে জুয়াড়িরা প্রচুর ডলার হারিয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় খেলায় বেশি ডলার লাগিয়ে সেটা তুলে নিতে চায়। তাই কলকাতা থেকে নতুন কে কে এল, তারা কেমন খেলোয়াড়, আজকের দলে কে কে খেলবে—এই সব খোঁজ খবর নেবার জন্যে তারা জড়ো হয়েছেন। প্রশ্নবাণে আমাদের অবস্থা কাহিল। ওদের সবারই হাতে নোটবুক। চটপট তাতে টুকতে আরম্ভ করল আমাদের খেলার কৌশলের হরেক খবর।

আবার তেল-খাওয়ানো একটি মেশিনের মতো মাঠের মধ্যে মোহনবাগান খেলল যেন যন্ত্রের সূক্ষ্মতায়। কম্বাইন্ড ইলেভেন হারল ৫—০ গোলে। কেষ্ট পাল পরপর চারটি গোল করার পর আমি শেষ গোলটি করেছিলুম। সারা স্টেডিয়ামের দর্শক স্বীকার করেছিল ফুটবলের শিল্প-নৈপুণ্যে ওটিই সেরা। পরের দিন একটি কাগজে আরও বড় শিরোনামা : "মোহনবাগান শেখাল কীভাবে ফুটবল খেলতে হয়।" স্বাভাবিক কারণেই আমরা আত্মতুষ্টিতে ভরপুর ছিলুম, কিন্তু সেই আত্মতুষ্টিই আমাদের কাল হল। তৃতীয় ম্যাচে সম্মিলিত চীনা দলের কাছে আমরা হেরে গেলুম ০—১ গোলে। সন্দেহ নেই, চীনারা সেদিন মরণপণ করে মাঠে নেমেছিল। ছায়ার মতো লেগে ছিল পি-কে, কেষ্ট পাল ও আমার সঙ্গে। তবু খেলায় আমাদের আধিপত্য ভাঙতে পারেনি। আমরা ভেবেছিলুম, যে-কোনও সময়েই গোল করতে পারব। গোল হতও, যদি আমার, রামনের ও পি-কের শট পোস্টে না লাগত। তবু অস্বীকার করছি না যে, প্রথমটায় হাল্কাভাবেই আমরা ম্যাচটিকে নিয়েছিলুম। তার ফলও পেলুম হাতেনাতে। একটা শিক্ষাও পেলুম, প্রতিদ্বন্দ্বীকে কখনো হাল্কাভাবে নিতে নেই। ওটিই ছিল সফরের শেষ খেলা।

শেষ খেলার আগের দিন ওখানকার 'নব ভারত ক্লাব' আমাদের সমুদ্র বিহারের ব্যবস্থা করল। চার-পাঁচখানা শাম্পানে চাপিয়ে নিয়ে গেল বহুদূরে। ওখানে সমুদ্রের বুকে আছে একটি 'অ্যাকোয়া কাফে'—ভাসমান রেস্তোরাঁ। পৃথিবী-বিখ্যাত। হলিউডের চিত্রতারকা ক্লার্ক গেবল্-অভিনীত বিখ্যাত ছায়াছবি "সোলজারস অব ফরচুন"-এর কয়েকটি দৃশ্য তোলা হয়েছিল এই রেস্তোরাঁ থেকে। নানা জাতের মাছের তৈরি এবং নানা ধরনের চীনা মুখরোচক খাদ্যের জন্য রেস্তোরাঁটির দারুণ নাম। আমরা কিন্তু খেয়ে তেমন তৃপ্তি পাইনি। কেমন যেন আধাসিদ্ধ এবং কাঁচা-কাঁচা গন্ধ। এর চেয়ে কলকাতার চীনা খাদ্য আমাদের কাছে অনেক উপাদেয় ও মুখরোচক। তবে রসনার তৃপ্তি না হলেও দু'ঘণ্টা ভাসমান রেস্তোরাঁয় বসে মনের তৃপ্তি পুরোমাত্রায় পেয়েছিলুম, দু'চোখ ভরে দেখেছিলুম সমুদ্রের সুন্দর দৃশ্য।

সহজভাবে গ্রহণ করায় আমরা শেষ ম্যাচটিতে যেমন হেরে গিয়েছিলুম, তেমন শেষ সময়ে শস্তার সওদা করতে গিয়ে দারুণ ঠকেছিলুম আমি। হংকং থেকে কলকাতার বিমান ছাড়ার বেশি দেরি ছিল না। আমার মনিব্যাগে তখনো কিছু বাড়তি ডলার ছিল। ভাবলুম তাড়াতাড়ি কিছু কিনে নিয়ে যাই। ট্যাক্স-ফ্রি-টাউন হংকংয়ের দোকানপসার তো বিদেশী পণ্যসম্ভারে ঠাসা। বিমান-বন্দরে যাবার পথেই দু-একটি দোকান ঘুরে একটি দোকানের দুটি শার্ট আমার ভারী পছন্দ হল। ভাল জামা তো আগে পরিনি। জামা দুটির দামও বেশি মনে হল না। তাছাড়া সুন্দর কার্ড-বোর্ডের বাক্সে স্বচ্ছ সিলোফেন পেপারের আড়ালে জামা দুটি এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে, কেনার লোভ সামলাতে পারলুম না। সাইজের প্রশ্নে দোকানি জোর দিয়ে বললেন "আমাদের সব স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ, পৃথিবীর লোক কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এই সাইজ আপনার ঠিক হবে।" তাড়াতাড়ি দাম মিটিয়ে দিয়ে খুশি মনে ছুটলুম বিমান-বন্দরে। লাগেজ আগেই বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। তাই প্যাকেট দুটি হাতে করেই প্লেনে চেপে বসলুম। শস্তায় সওদা করার বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে বন্ধুদের সামনে প্যাকেট খুলেই আমি একেবারে বোবা হয়ে গেলুম। ও হরি, শার্টের শুধু সামনের দিকটায় কলার লাগানো আছে পেছনের দিকে কিছুই নেই। এমন পরিপাটি করে কলার লাগানো ছিল যে, একটুও সন্দেহ জাগেনি। বন্ধুরা ঠাট্টা করতে আরম্ভ করল। আমি নাকি সত্যিই 'বাঙাল'। বাঙাল কথাটি শুনতে-শুনতে কানে আর কটু লাগত না। ওইভাবে ঠকারও একটা আনন্দ আছে, শিক্ষা আছে। শুনেছি, এডেনেও এইভাবে খরিদ্দার ঠকানো হয়।

২৩ মার্চ বেলা দুটোয় আমাদের প্লেন হংকংয়ের আকাশে উড়ল। ব্যাঙ্কক ও রেঙ্গুন ছুঁয়ে রাত প্রায় ১২টায় এসে পৌঁছল দমদমে। সফল সফরের পর ঘরে ফিরে এসেছি। সুতরাং আনন্দে মন ভরে ছিল। কিন্তু ভাবনা হল, মাস দেড়েক পরেই কলকাতার ফুটবল মরসুম। আমার এবার আসল অগ্নিপরীক্ষা। (ক্রমশ)

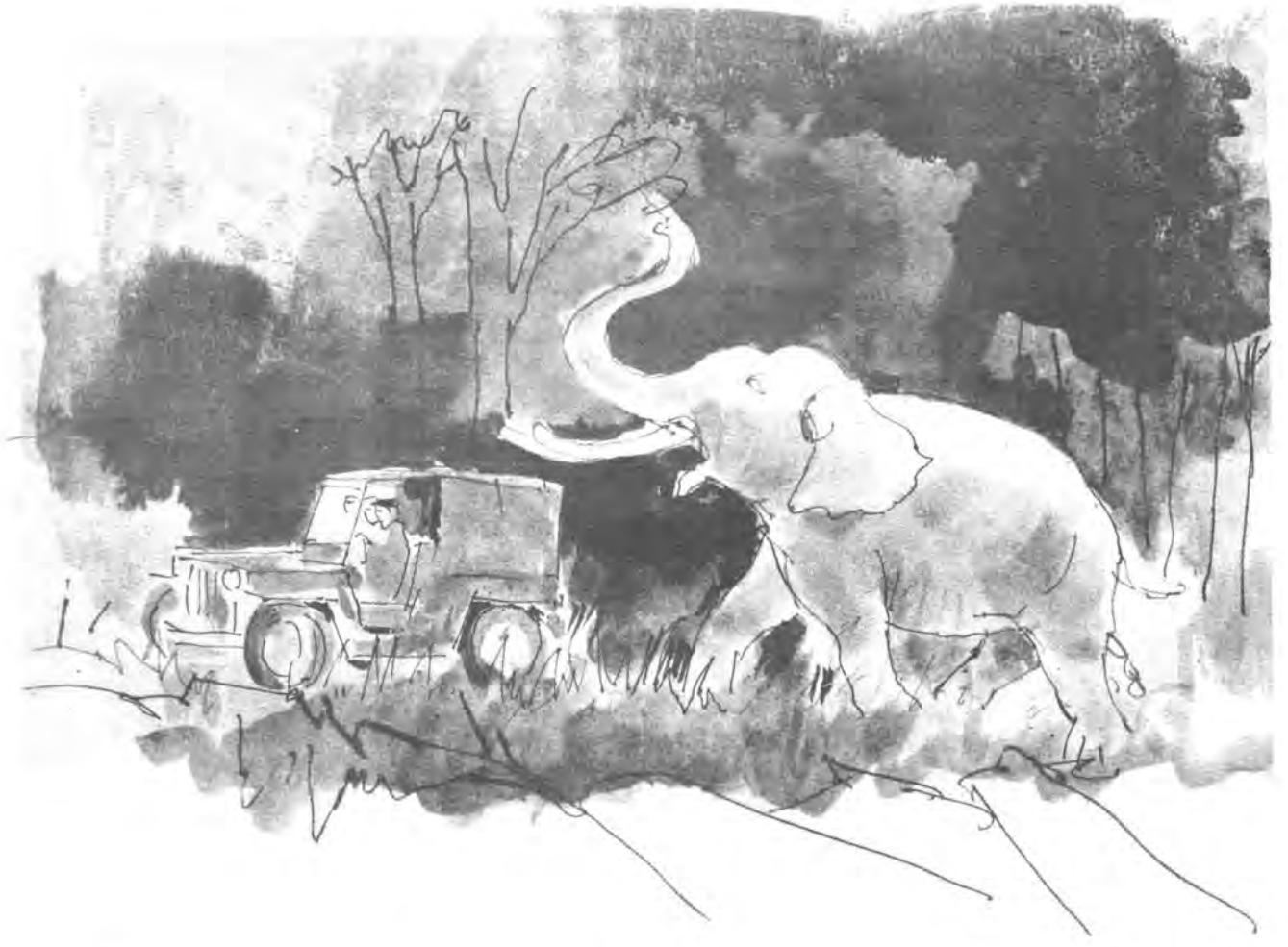

হাতি বনাম জীপ

অজিতকুমার সেন

স্টীয়ারিংয়ে নিপুণ হাতের মোচড় দিয়ে, আচমকা ব্রেক কষে বলাইবাবু এক মস্ত তেমাথায় জীপটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "সেনদা, এই হল শাজাহান রোড। সোজা ভুটান-ঘাট পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। ভাল করে দেখে নিন। এই রাস্তাতেই আমি একটা খুনী হাতির মুখ থেকে এই জীপটাকে বার করে এনেছিলাম।"

ডুয়ার্সের ঘন সবুজ বনের বুক চিরে বিশাল এক চওড়া রাস্তা সোজা উত্তর দিকে বেরিয়ে গেছে। দুধারে তেতলা বাড়ির সমান উঁচু বড়-বড় শাল-সেগুন গাছের সার মাপমতন দূরত্ব বজায় রেখে মাইলের পর মাইল দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টই বসিয়েছে, গায়ের তক্‌মা থেকে বোঝা গেল তাদের বয়েস চল্লিশেরও বেশি। গাছগুলোর তলায় ঘন সবুজ ঝোপ-ঝাড়ের জড়াজড়ি। অমন মসৃণ, চওড়া আধুনিক পিচের রাস্তার সঙ্গে বুনো হাতিকে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। সেদিনের সেই মেঘলা সন্ধ্যায়, জীপের মধ্যে বসেও গা ছমছম করে উঠল। ঝিঁঝির জ্যাজ পড়ন্ত বিকেলেই গা-ছমছম রাতের আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে।

ভয়ের আবরণ ঝেড়ে ফেলে প্রশ্ন করলাম, "শাজাহান রোড নামটা কেন হল?"

হেসে ফেললেন বলাইবাবু, "যা ভাবছেন তা মোটেই নয়। শাজাহান ছিল এক কুলি সর্দার। তারই নামে রাস্তার নাম রেখে ইংরেজরা তাকে সম্মান দিয়ে গেছে। লোকটা জবরদস্ত ছিল নিশ্চয়ই, তা না হলে এই বাঘ আর হাতির আস্তানায় কুলিদের সামলে এত বড় দুঃসাহসিক কাজ করতে পারত? চলুন, এগোনো যাক। বাগানে রাত আটটার মধ্যেই আপনাকে জমা না দিতে পারলে, ম্যানেজারবাবু হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধাবেন।"

সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি গিয়ার পালটাতে পালটাতে জীপে স্পীড দিলেন।

আমি তখন ওখানে নতুন গিয়েছি চা-বাগানে চাকরি নিয়ে। ম্যানেজারবাবই লোকাল গার্ডিয়ান, তার ওপর অন্তরঙ্গ বন্ধুর সম্পর্কে খুড়শ্বশুর হন ভদ্রলোক। সুতরাং, আমাকে নিয়ে তাঁর সাবধানতার অন্ত ছিল না, বিশেষ করে কেউটে, গোখরো, বাঘ-হাতি-ভরা ডুয়ার্স এলাকায়। বাগানেরই একটা কাজ দিয়ে তিনি জলপাইগুড়ি শহরে আমায় পাঠিয়েছিলেন, বলাইবাবুর জিম্মায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘনায়মান অন্ধকার চিরে প্রায় নতুন জীপটা জোরালো হেডলাইট জ্বেলে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল আলিপুর-দুয়ারের দিকে। ওখান থেকে পাক্কা ন'মাইল দূরে জলদাপাড়া রিজার্ভ ফরেস্টের কোল ঘেঁষে আমাদের বাগান।

কাঠবোঝাই গোটা দুয়েক লরিকে পাশ দিয়ে বলাইবাবু ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "শুনুন তাহলে ঘটনা। বাগানে বড় গোছের কেউ এলেই আমার ওপর ভার পড়ে তাঁকে জঙ্গল দেখাবার। ছোট ম্যানেজার বন্দুক হাতে নিয়ে পাশে থাকেন অবশ্য, কাজের তাগিদ পড়লে অনেক সময় আবার থাকেনও না। বছর চারেক আগের কথা বলছি। এই জীপটা সে বছর কেনা হয়েছিল। এক মস্ত বাঙালী অফিসার সস্ত্রীক এসেছেন বাগানে। সেদিন ছুটির দিন, দুপুরে খেয়ে উঠে কোয়ার্টার্সে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ বড় বাংলো থেকে ম্যানেজারবাবু ডেকে পাঠালেন। জীপ নিয়ে হাজির হতেই ওঁরা দুজনে উঠলেন। হুকুম হল রাজাভাতখাওয়া ফরেস্ট যাওয়ার।

"এই শাজাহান রোডে যখন ঢুকেছি তখন বেলা পড়ে এসেছে। খানিকটা গিয়েই ফিরে আসা হবে, এই স্থির হল। অতি চমৎকার রাস্তা, দুধারের দৃশ্য অতি চমৎকার। নতুন জীপ, তার ওপরে আমার স্পীড তোলার বাতিক যে কী, তা এতক্ষণে নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছেন। রাস্তার ধারেকাছে কোনো জনবসতি নেই। কদাচিৎ গাড়ি চলে এ-পথে। কান খাড়া করে চালাচ্ছি। হঠাৎ গাছের ওপরে বাঁদরদের লম্ফঝম্প ও জোর কিচমিচ শব্দ শুনে স্পীড কমালাম। প্রায় একশ গজ দূরে একটা বাঁক, আর তারই মুখে দাঁড়িয়ে বিশাল এক দাঁতাল মাকনা হাতি, স্থির হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। ভুটানঘাট পাহাড় থেকে বর্ষার আগে প্রায়ই হাতি নামে এ-জঙ্গলে। এ-রাস্তা তাই এড়িয়ে চলে সকলেই। এ-কথা জানা ছিল ঠিকই, কিন্তু সিজনের এত আগে এত বড় হাতি নামার খবর তো জানা ছিল না। এ-সব খবর লোকমুখে বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে যায় তামাম ডুয়ার্স অঞ্চলে। মাথাটা বিলকুল ঠাণ্ডা রেখে, এক লহমার মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম।

"এক ঝটকায় ইউ টার্ন নিয়ে জীপের মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছি। পিছন থেকে বিকট চিৎকার তুলে পাহাড়ের মত হাতিটা তাড়া করে আসছে। পা আমার থেবড়ে বসেছে অ্যাকসিলেটারের ওপর, বুকের তলায় স্টীয়ারিং, তবু মনে হচ্ছিল গাড়ি যেন নড়তেই চাইছে না। আমার ডানদিকের সিটে অফিসার ভদ্রলোক, পিছনের সিটে তাঁর স্ত্রী। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি রাক্ষসটা লম্বা-লম্বা পা ফেলে ছুটে এসে লম্বা শুঁড় দিয়ে পিছনের হুডের রডটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। এই অবস্থাতেই একবার সেই শুঁড়ে ভদ্রমহিলার গলা ছুঁয়েও গেছে। প্রচণ্ড চিৎকার করে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন, কিন্তু জোর বরাত যে, হুমড়ি খেয়ে সাহেবের পিঠের ওপরই লুটিয়ে পড়লেন। একটিবার হুডের রড ধরতে পারলেই মোচড় দিয়ে জীপ উলটে দিত হাতিটা। অনেক দূর পর্যন্ত তেড়ে এসেছিল হাতিটা, কিন্তু নতুন জীপের কাছে তার দম কতটুকুই বা।"

ভয়ে প্রায় আড়ষ্ট হয়ে গল্পটা শুনলাম, তারপর প্রশ্ন করলাম, "কত স্পীডে ছুটেছিল হাতিটা?"

"তা কি লক্ষ করার মত অবস্থা ছিল আমার? তবে আন্দাজে বলতে পারি, ঘণ্টায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মত স্পীড ছিল ওর," বলাইবাবু জবাব দিলেন।

তারপর একটু থেমে বললেন, "এসে গেছি বাগানে। যাক, গল্প করতে করতে দিব্যি এসে গেলাম। এতটুকু অবিশ্বাস করবেন না কিন্তু, এটা গল্প হলেও খাঁটি সত্যি।"

ছবি সুধীর মৈত্র

যারা কচি কাঁচা তাদের ত্বকের

নিরাপত্তার জন্য চাই

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

ছোটদের নিয়ে মেলাই ঝক্কি ঝামেলা। আর এক দুর্ভাবনা তাদের কোমল ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষা। জীবাণু সংক্রমণের ভয় তাদের ক্ষেত্রেই বেশি। মায়েদের সব ভাবনা থেকে ছুটি দিল বোরোলীন। কাটা ছেঁড়া ফাটায় অনবদ্য। রুক্ষ, শুষ্ক কিংবা ঝলসানো ত্বকেও অদ্ভুত কাজ করে

বোরোলীন

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড • বোরোলীন হাউস • কলিকাতা-৭০০ ০০৩

বিশ্বকাপ ফুটবল / সচিত্র ধারাবিবরণী

পতপত করে উড়তে লাগল উরুগুয়ের পতাকা..
উরুগুয়ের মানুষেরা আনন্দে সেদিন রাতে ঘুমুতে পারেনি। দেশ জুড়ে চলল নাচ আর গান...

উরুগুয়ে সরকার জাতীয় ছুটি ঘোষণা করলেন। ছুটির দিনের আনন্দ আর উল্লাস দেখে ইউরোপের এক সাংবাদিক লিখেছিলেন, "যুদ্ধবিরতির পরে প্যারিসে যে আনন্দ-উল্লাসের বান ডেকে গিয়েছিল, এখানকার ব্যাপার দেখে তারই কথা আমার মনে পড়ছে।" আর্জেন্টিনায় কিন্তু বইল বিক্ষোভের ঝড়। সেখানকার খবরের কাগজে লেখা হল, চোরামি করে তাদের হারানো হয়েছে। বিক্ষুব্ধ জনতা উরুগুয়ে-দূতাবাসের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিস তাদের আটকায়।

সমাপ্ত হল প্রথম বিশ্বকাপ-ফুটবলের মহা-অনুষ্ঠান। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও সবাই বুঝে গেল যে, এ-খেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়া শক্ত হবে।

(আগামী বারে ঃ চৌত্রিশের বিশ্বকাপ-অনুষ্ঠান)

বিশ্বকাপ-ফুটবলের ফাইনাল-পর্যায়ে

সেরা ষোলটি দেশের সেরা ষোলজন খেলোয়াড়

আর্জেন্টিনা

ড্যানিয়েল পাসারেলা (সেন্টার-ব্যাক)

পশ্চিম জার্মানি

রেনার বনহফ (ডিফেন্স/মিডফীল্ড)

ব্রাজিল

জিকো (ফরোয়াড)

হল্যাণ্ড

রুডি ক্রল্ (সেন্টার-ব্যাক)

হাঙ্গারি

টিবর নিয়িলাসি (মিডফীল্ড)

টিউনিসিয়া

তারেখ ধিয়াব (মিডফীল্ড)

অস্ট্রিয়া

হান্স ক্রাংকল (স্ট্রাইকার)

ইরান

আলি পারভিন (মিডফীল্ড)

ইতালি

রবার্টো বেটেগা (স্ট্রাইকার)

পোল্যাণ্ড

কাজিমিয়েরজ ডেনা (মিডফীল্ড)

স্পেন

জোস পিরি (সেন্টার-ব্যাক)

স্কটল্যাণ্ড

কেনি ডালগ্লিশ (স্ট্রাইকার)

ফ্রান্স

মিচেল প্লাতিনি (মিডফীল্ড)

মেক্সিকো

ভিক্টর র‍্যানজেল (স্ট্রাইকার)

সুইডেন

রনি হেলস্ট্রম (গোলকীপার)

পেরু

হেক্টর চামপিটাজ (সেন্টার-ব্যাক)

তোমাদের পাতা

চিঠি

"মাসিক আনন্দমেলা" আমার ভীষণ ভাল লাগে। এত ভাল পত্রিকা আমি আর একটাও দেখিনি। পত্রিকাটি আমাদের বাড়িতে এলে পড়ার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। বেশ কয়েক-জন পড়ুয়া আমাদের বাড়িতে, কিন্তু ঠিক দিন দশেকের মধ্যে পত্রিকাটি সবার পড়া হয়ে যায়। তখন পরের সংখ্যার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার থাকে না। আচ্ছা, আপনারা মাসে দুটো করে সংখ্যা বার করতে পারেন না ?
পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স-১৪)

আমি, আমার মা, আর ঠাকুমা "মাসিক আনন্দমেলার" খুব ভক্ত। আমার ভাল লাগে কমিকস, মায়ের ভাল লাগে গল্প, ঠাকুমার ভাল লাগে উপন্যাস। বাকি লেখাপত্তরগুলোও আমরা পড়ি। কিন্তু পরে। পরে মানে খুব পরে নয়। নতুন আনন্দমেলা পনেরো দিনের মধ্যেই পুরনো হয়ে যায়। পত্রিকাটি পাক্ষিক হলে খুব ভাল হয়।
মিমি আদিত্য (বয়স ১২)

মাসিক আনন্দমেলা পাক্ষিক করার অনু-রোধ আমরা বছর দুয়েক ধরে করে আসছি। আপনারা আমাদের চিঠি ছেপেছেন, তবে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। আমরা কিন্তু চিঠি ছাপাবার জন্য চিঠি লিখিনি। সম্ভব হলে পত্রিকাটি পাক্ষিক করবেন। কারণ এই পত্রিকাটি আমাদের খুব প্রিয়।
অলকনন্দা মিত্র (বয়েস-১২)
সংযুক্তা মিত্র (বয়স-১৪)

র‍্যাট-কিলার

আমাদের বাড়িতে একটা পোষা বেড়াল ছিল। বেড়ালটাকে আমি অন্যের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছিলাম। আস্তে আস্তে সে বেশ বড় হয়ে উঠল। বেড়াল পোষায় আমার দিদার খুব আপত্তি ছিল। কারণ, বেড়াল থেকে নাকি নানারকমের অসুখ হয়। তাছাড়া বেড়ালটা খাবার বাটিতেও মুখ দিত।

ইঁদুর মারবে বলে বেড়ালটার নাম দেওয়া হল র‍্যাট-কিলার। একদিন ওকে খাবার দিতে গিয়ে দেখি, ও অঘোরে ঘুমোচ্ছে আর ওর সামনে কয়েকটি ইঁদুরের বাচ্চা মহা আনন্দে লাফালাফি করছে।
অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (বয়স—১২)

চিড়িয়াখানা

বাঁদরের বাঁদরামি
সিংহের ডাক
ময়ূরের নাচ দেখে
হলাম অবাক।
অনুরাধা পাল (বয়স-৮

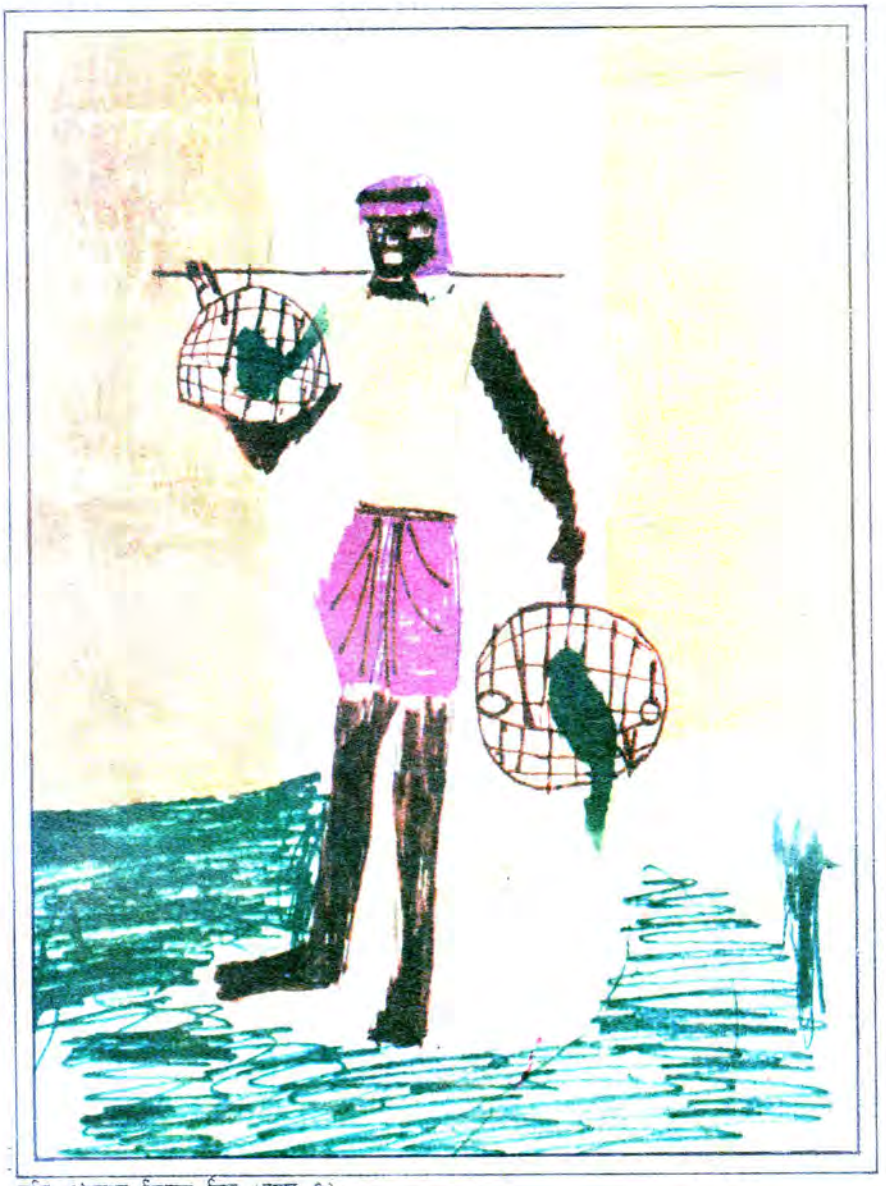

ছবি এঁকেছে তিলক মিত্র (বয়স ৭)

বাবনা বুড়ো

নূপুর পরে পায়
বাবনা বুড়ো মায়
ফোকলা দাঁতের হাসি হেসে
মায়ের কোলের কাছে ঘেঁষে
আঙুল তুলে বলে দিদিভাই
খড্ড তুমি পেয়েছ লাই
সকাল থেকেই খেলছ খালি
পড়াশুনোর নেই বালাই ?
ঝুমকা ভাদুড়ী (বয়স-১২)

মিনি

আমাদের ছোট বেড়াল
নাম তার মিনি,
খেতে বড় ভালবাসে
দুধ ভাত চিনি।
মাছ পেলে মিনি
আর কিছু চায় না,
রাত্তিরে বাড়ি থাকে
কোথাও সে যায় না।
গীতা রায় (বয়স—১২)

কেটে রেখে দিন

বোর্নভিটা

আবিষ্কারের আজব কাহিনী-২

ইলেকট্রিক বাল্বের বিস্ময়কর কথা

আবিষ্কারক ঃ টমাস আল্‌ভা এডিসন
১৮৪৭-১৯৩১ ইউ. এস. এ

সূত্র ঃ বিদ্যুৎ শক্তিকে আলো আর তাপশক্তিতে পরিণত করা।

বছর ঃ ১৮৭৯

ইলেকট্রিক বাল্ব কিভাবে কাজ করে?

ইলেকটিক বাল্বে আছে মূলতঃ দুটো ধাতুর রড, যা খুব পাতলা, বেশী কয়েল-করা টুঙ্গস্টেন তারের দ্বারা সংযুক্ত থাকে। রড দুটো থাকে এক কাঁচের বাল্বে। আর এই বাল্বে ভরা থাকে নাইট্রোজেন আর আরগন-গ্যাসের এক মিশ্রণ।

বিজলী-বাতি জ্বালাতেই টুঙ্গস্টেন-কয়েলের ভেতর দিয়ে এক বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব'য়ে যায়। এই টুঙ্গস্টেন—কয়েল খুব পাতলা ব'লে তা বিদ্যুৎ-প্রবাহে জোর প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলে, আর তাতে এক বৈদ্যুতিক ঘর্ষণ বা ফ্রিকসানের সৃষ্টি হয়। এই ঘর্ষণের দরুন কয়েল থেকে নেগেটিভে চার্জ-করা বহু-সংখ্যক অণু বা ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। কয়েল পজিটিভে চার্জ হ'তেই ইলেকট্রন গুলোকে আবার আকর্ষণ করে ফিরিয়ে আনে। আর তাতেই তাপ আর আলোর শক্তি বেরিয়ে আসে।

টুঙ্গস্টেন কেবলমাত্র খুব বেশী তাপ-মাত্রায় (৩৩৮০° সেন্টিগ্রেড) গ'লে যায় বলে, এটুকুতে তা গ'লে যায় না। কাঁচের বাল্বে কোনো অক্সিজেন থাকেনা। তাই এটি পুড়েও যায় না।

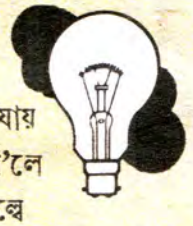

OBM-8990-BEN

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
তোমাকে দেয় এগিয়ে থাকার বাড়তি শক্তি

কেটে রেখে দিন

বিশেষ সুযোগ ঃ ২

এক বিশিষ্ট পরিবেশকের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে আমরা বৃটেনে মুদ্রিত "The How and Why Wonder Book of Electricity" (ইংরেজীতে) ৫০ পাতার রঙীন সচিত্র এবং চিত্তাকর্ষক একটি বই আপনাদের মাত্র ৬ টাঃ ৫০ পয়সার সুলভ মূল্যে, (আসল মূল্য ৫০ পেন্স) বিনা ডাক খরচে, যোগানোর ব্যবস্থা করেছি। এই বইটি পাওয়ার জন্য আপনি মানিঅর্ডার দ্বারা ৬ টাঃ ৫০ পয়সা আর পৃথক ডাকে বোর্নভিটার যে কোনো প্যাক থেকে একটি কয়েল বা ওপরের ফ্ল্যাপ পাঠান এই ঠিকানায়ঃ Department : 13A, India Book House, 22 Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 শিগগীর! বই কিন্তু বেশী নেই।

গোয়েন্দা বাজ

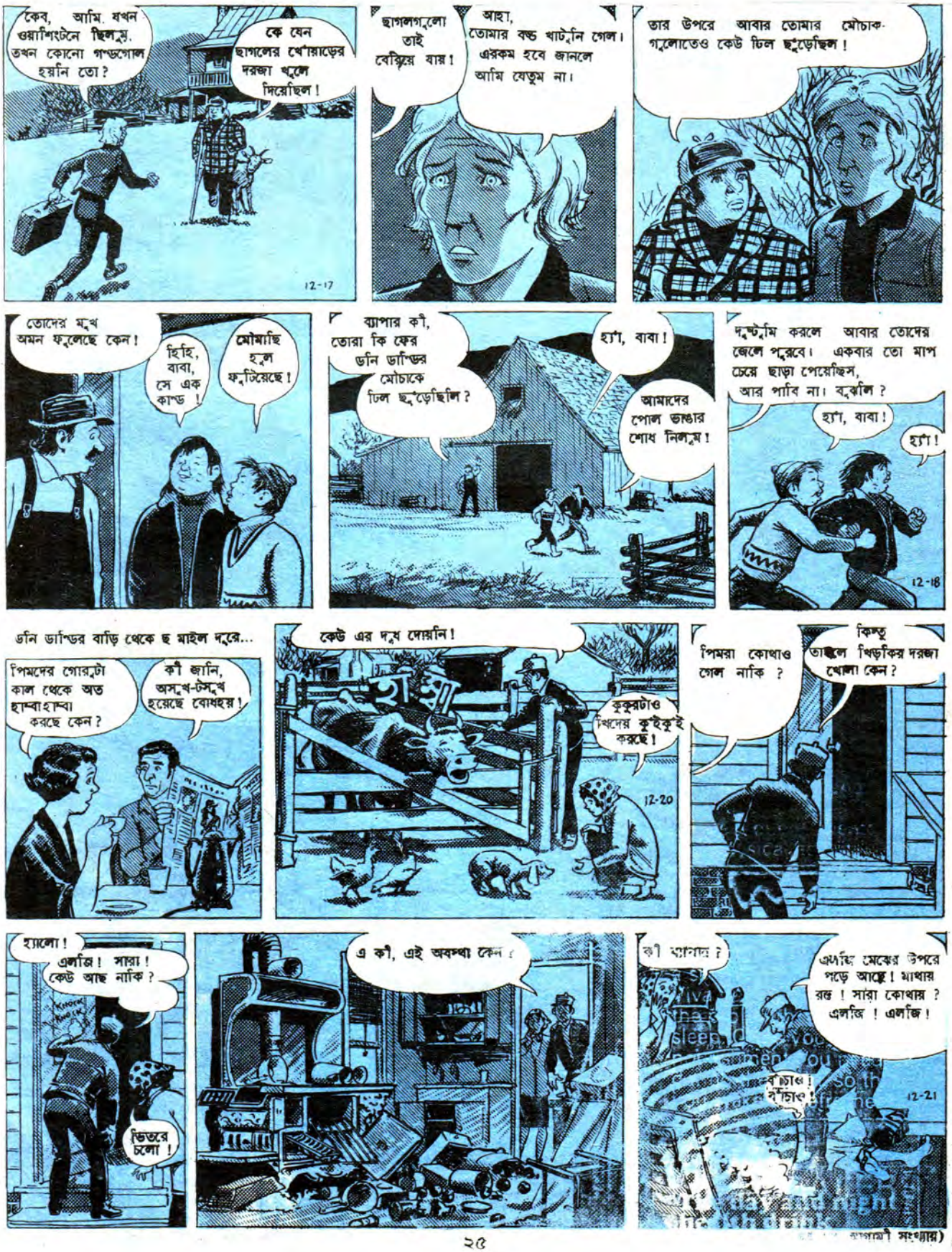

(আগামী সংখ্যায়)

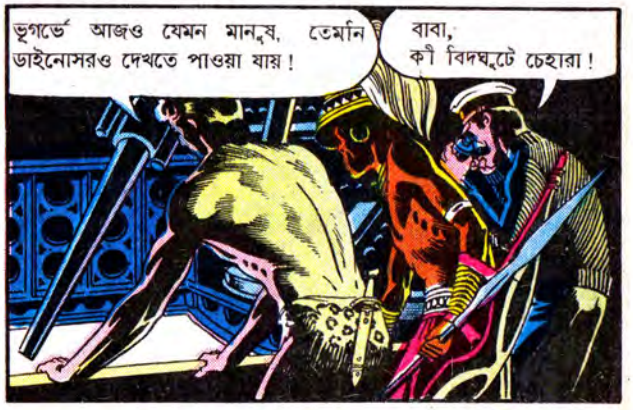

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ওরা কারা টারজান ?
ওরা সর্প-মানব... লিডির উপরের যোদ্ধাদের আক্রমণ করছে !
ভূগর্ভে আজও যেমন মানুষ, তেমনি ডাইনোসরও দেখতে পাওয়া যায় !
বাবা, কী বিদঘুটে চেহারা !
কামান চালিয়ে আক্রমণকারীদের ভয় পাইয়ে দাও ! কিন্তু কাউকে মেরো না !
ভয় পেয়েছে ! আবার কামান দাগো !
কাজ হয়েছে ! সর্প-মানবরা পালাচ্ছে !
ভাল ! এবারে এই বিমানটাকে ওই ডাইনোসরের কাছাকাছি নামাও !

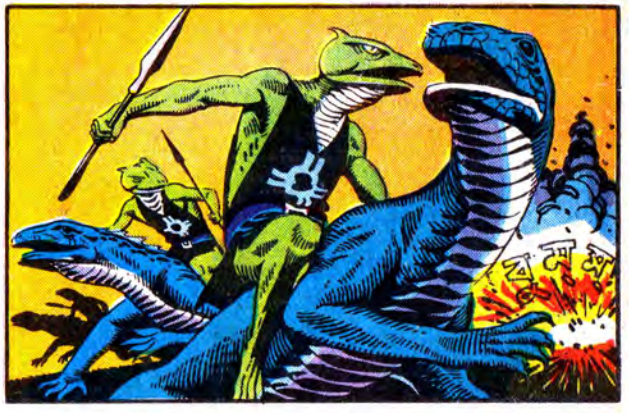

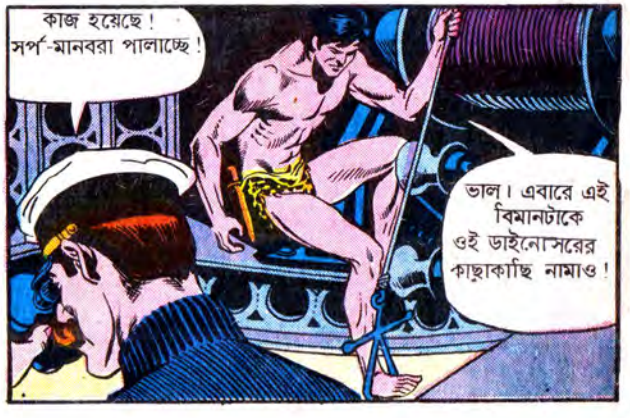

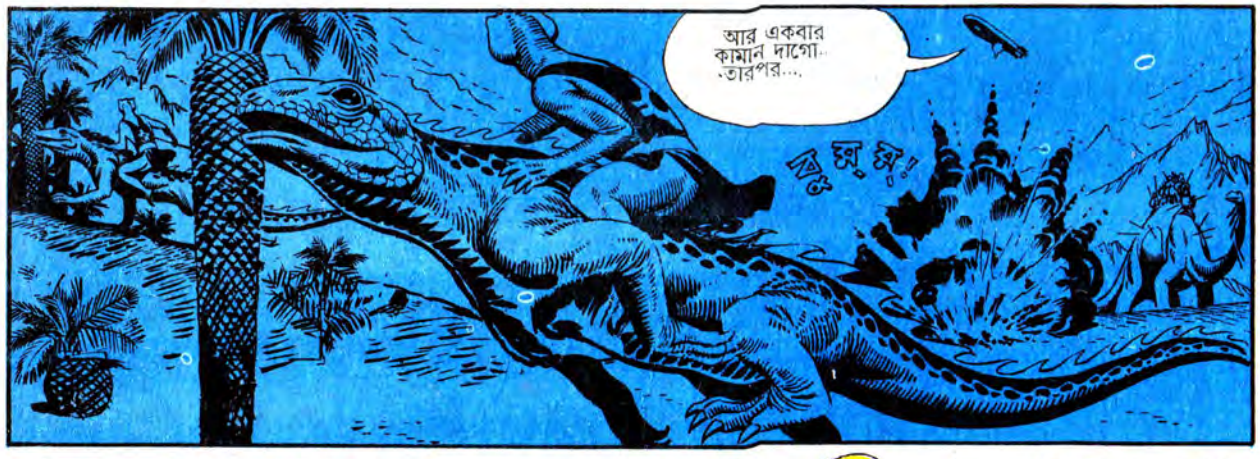

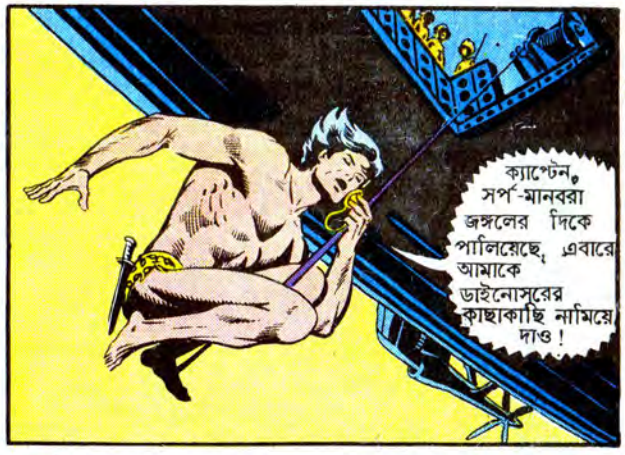

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

শব্দ সন্ধান

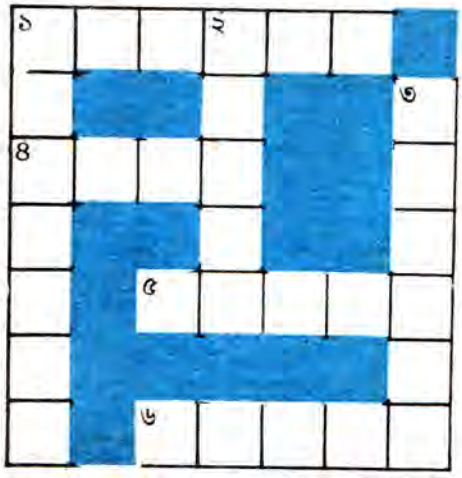

এবারের শব্দ-সন্ধান বই-পড়ুয়াদের জন্যে। বাংলা শিশু বা কিশোর-সাহিত্যে অঢেল বই রয়েছে, শব্দছকের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে কটাকেই বা বন্দী করা সম্ভব! শুধু আটখানা বিখ্যাত বইয়ের নাম ফাঁকা ঘরগুলোতে লুকিয়ে আছে—তোমাদের খুঁজে বার করার অপেক্ষায়। বইগুলো তোমাদের নিশ্চয়ই পড়া, আর লেখকের নাম তো অজানা থাকতেই পারে না।

সংকেত : পাশাপাশি (১) পাহাড়, তবে পৃথিবীর নয়। (৪) রিদয় নামের ছেলেটা কোন্ বইতে আছে? (৫) প্রথম দু অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের লেখা বই, সব মিলিয়ে ছান্দসিক কবির। (৬) কোন্ কোন্ বাংলা বর্ণমালা একটু অন্যরকম সাজালে গোলমেলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়?

উপর-নীচ : (১) কোনও-এক বুড়োর বই, কিন্তু ছোটদের পড়ার। (২) যার নামের অর্থ রাম, তারই নানান কাণ্ডকারখানা। (৩) নাম শুনে মনে হয়, পাগলের প্রলাপ, কিন্তু এমন প্রাণান্তকর হাসির বই আর আছে কি?

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ধাঁধা

"এবারের প্রথম ধাঁধা ঘড়ি নিয়ে।" ছোট্কা বলল।

কথাটা শুনে আমি একটু অবাকই হলাম। কেননা, এই কদিন আগে ছোটকার বহু সাধের হাতঘড়িটা হঠাৎই বিগড়ে গিয়েছে। একদম বন্ধ। নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। ছোট্কা সেটাকে তড়িঘড়ি সারাতেও দিয়ে এসেছে। কিন্তু এখনও ফেরত আসেনি। ছোট্কার ঘরে অবশ্য আদ্যিকালের একটা দেয়াল-ঘড়ি রয়েছে। এখন সেটাই একমাত্র সম্বল।

ছোট্কার হাতের দিকেই তাই প্রথম নজর চলে যায়। নিশ্চয়ই হাতঘড়িটা আজই ফেরত পেয়েছে ছোট্কা। নাহলে হঠাৎ ঘড়ি নিয়ে ধাঁধার কথা উঠবে কেন। কিন্তু কই, ছোট্কার হাতে তো ঘড়ি নেই! হাতের সেই জায়গাটায়, যেখানে ঘড়ি বাঁধা থাকত, সাদা দাগটাও এখন বেশ মিলিয়ে এসেছে। ঘড়ি ছাড়া প্রথম দিকে কী বিশ্রী দেখাত ওই চওড়া, সাদা জায়গাটা। ছোট্কা আসলে সব সময়ে ঘড়ি পরে থাকত, সেই জন্যেই বোধহয় অমন গভীর দাগ বসে গিয়েছিল।

ছোট্কা আমার ভাবনার কারণটা বুঝে ফেলেছে মনে হল। কেননা, এরপরই ছোট্কা বলল, "কী ভাবছ সতুবাবু? হাতঘড়ি আসেনি এখনো। দম দিতে ভুলে গিয়েছিলাম বলে দেয়ালঘড়িটাও বিকেলে বন্ধ হয়ে ছিল। কী বিশ্রী ব্যাপার ভেবে দ্যাখো। বাড়িতে দ্বিতীয় ঘড়ি নেই যে, তক্ষুনি দেয়ালঘড়িটা মিলিয়ে চালিয়ে দেব।"

"কী করলে তাহলে?" আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। কেননা, দেয়াল-ঘড়িটা তো ভালই চলছে মনে হয়। এইমাত্র খেলে ফিরেছি। সময়টার যে-আন্দাজ রয়েছে তাতে মনে হয়, ঘড়িটা ঠিক সময়ই দিচ্ছে।

ছোটকা বলল, "সেই কথাই তো বলছি। মোড়ের মাথায় রামবাবুদের বাড়িতে গেলাম। একটুক্ষণ থেকে চলে এলাম। রামবাবু তো ঘড়ি-ধরা লোক। ও'র ঘড়ি নির্ভুল সময় দেয়। তাই একটা সহজ হিসেব করে নিলাম বাড়ি ফিরে। তারপর ঘড়িটা ঠিক করে চালিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার হাতে তো ঘড়ি ছিল না। তাই রামবাবুদের বাড়ি থেকে ফিরতে কত সময় লাগল তা জানলাম কী করে? আর তা যদি না জানা যায়, তাহলে দেয়াল-ঘড়িটাই বা কী হিসেবে চালিয়ে দিলাম বলতে পারো সতুবাবু?"

আমি ঘাড় নাড়লাম। পারি না। ছোট্কা বলল, "সেইটেই তাহলে **প্রথম ধাঁধা** হোক এবার।"

তাই হোক। সুতরাং ছোট্কা কী হিসেব করে দেয়াল-ঘড়ি মিলিয়েছিল, সেটা হিসেব করে বার করো।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ অর্ধেক হল সংখ্যাটির তিন ভাগের এক ভাগ। সংখ্যাটি কত?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ দুজন সাইকেল-চালক মুখোমুখি সাইকেল চালাচ্ছে। মুখোমুখি, কিন্তু আরম্ভে দুজনে রয়েছে ১৮০ মাইল দূরত্বে। একটা মাছির কী খেয়াল গেল কে জানে। সে করল কী, একজন সাইকেল-চালকের কাঁধ থেকে উড়তে শুরু করে সোজা চলে গেল অপর সাইকেল-চালকের কাঁধে। সেই চালকটিকে ছুঁয়েই আবার ফিরে এল প্রথম জনের কাঁধে। আবার উড়ে গেল দ্বিতীয় জনের কাছে, ফের ফিরে এল।

এভাবে অস্থির মাছিটি কেবলই যাতায়াত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দু জন সাইকেল-চালক একে অন্যকে যখন পথে ধরে ফেলল একেবারে সামনাসামনি, তখন শান্ত হয়ে একজন সাইকেল-চালকের কাঁধে বসল মাছিটি। মাছির গতি ছিল ঘণ্টায় তিরিশ মাইল, আর সাইকেল-চালকেরা প্রত্যেকে চালিয়েছে ঘণ্টায় পনের মাইল বেগে। মাছিটা কত মাইল ওড়াউড়ি করেছে?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ শূন্যস্থানে উপযুক্ত সংখ্যা বসাও

১২ (১০) ১৮
২৪ (?) ৯

গতবারের উত্তর ॥ যে মেয়ে বোম্বেতে সে-ই ক্রিকেট খেলে। অনিলা বোম্বেতে নেই, সুতরাং অনিলা নয়। চিত্রা ক্রিকেট খেলে না। সুতরাং বেলা বোম্বেতে ক্রিকেট খেলছে। চিত্রা মাদ্রাজে নেই। সুতরাং অনিলা মাদ্রাজে। চিত্রা দিল্লিতে। কিন্তু দিল্লিতে যে আছে, সে গলফ খেলে না। সুতরাং অনিলাই মাদ্রাজে গলফ খেলতে গিয়েছে।

(২) যতন ৫০ টাকা। রতন ৩০ টাকা। (৩) ৫০০ জন (৪) ৪৫×১২=৫৪০ সুতরাং বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা ৫৯×১১=৬৪৯।

ছবি অহিভূষণ মালিক

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল টুথপেস্টের টিউবের মুখের ছবি ফোটো তপন দাস

উত্তর বটে

প্রঃ কোন প্রদেশবাসীর সঙ্গে বাঙালীর গায়ে-গায়ে ভাব?

উঃ পাঞ্জাবি।

প্রঃ কারও পক্ষে কি পৃথিবীর সব জায়গা দেখা সম্ভব?

উঃ অসম্ভব নয়, আমি তো প্রায়ই দেখি ম্যাপ-বই খুলে।

প্রঃ উত্তর কলকাতার ঠনঠনে আর মধ্য কলকাতার তালতলায় তফাতটা কোথায়?

উঃ চটিতে। ঠনঠনের নাক উঁচু আর তালতলার থ্যাবড়া।

প্রঃ কোন গাছ তবলা বাজায়?

উঃ তালগাছ।

প্রঃ একজন ম্যাজিশিয়ান বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলে একটি টেনিস বল ধরে সবাইকে দেখাল। তার উপর একটি রুমাল চাপা দিয়ে মন্তর পড়বার সময় বলটাকে জামার ঢোলা আস্তিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ডান হাত দিয়ে রুমালটা তুলে নিলে বাঁ হাতে কী থাকবে?

উঃ পাঁচটা আঙুলই থাকবে।

প্রঃ কোন সিটির ইংরেজি বানান S দিয়ে লিখতে হয়, C দিয়ে নয়?

উঃ UNIVERSITY

প্রঃ সরল রেখা কখন বাঁকা হয়?

উঃ আঁকবার সময় ছোট বোন যখন পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। সুসেন

মজার খেলা

টেবিলের ওপর একটা রুমাল রেখে দাও। তারপর বন্ধুদের বলো, রুমালের দুটো প্রান্ত দু-হাতে নিয়ে হাত একদম না-ছেড়ে একটা গিঁট ফেলে দিতে হবে রুমালটায়। কেউ কি চেষ্টা করে দেখবে, পারা যায় কিনা?

চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে দু-একজন। কিন্তু হাত না ছেড়ে গিঁট ফেলা মোটেই সম্ভবপর নয় যদি না কায়দাটা কারো জানা থাকে।

এবার তোমার পালা। প্রথমেই হাত দুটো বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে রেখে দাঁড়াও। এবারে রুমালের দু-প্রান্ত দু-হাতে নিয়ে রুমাল না ছেড়ে হাত দুটো বার করে আনো। দেখবে রুমালের মাঝখানে একটা গিঁট পড়ে গিয়েছে।

রুমালটা ধরতে একটু কষ্ট হতে পারে প্রথমে। কিন্তু সামান্য অভ্যেস করলে মোটেই কঠিন নয় ব্যাপারটা।

নিজে ভাল করে রপ্ত করে নাও কায়দাটা। তারপর বরং বন্ধুদের দেখিও। দারুণ মজার খেলা এটা। চাই কী, ঠিক-মতো দেখালে হাততালিও পেয়ে যেতে পারো।

মজারু

শুধু একবার

বাসে বসে একটি ছেলে আপনমনে চুইংগাম চিবোচ্ছিল। পাশেই বসে ছিলেন এক বুড়ো ভদ্রলোক। তিনি অনেকক্ষণ ছেলেটির মুখনড়া লক্ষ করে অবশেষে বললেন, "বাবা, তুমি কী বলছ, একটু চেঁচিয়ে বলো, আমি কানে কম শুনি, জোরে না বললে শুনতে পাই না।" —তা-রা

আটখানা

এবারের আটখানা দিয়ে যে ভয়ংকর মাছ তৈরি করেছি, নাম তার হাঙর। যে দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়ায় সমুদ্রে, যার নাম শুনে ভয়ে অনেকের পিলে চমকে ওঠে। ভয়ানক আর বিশাল আকৃতি এই হাঙরের পাল্লায় যে একবার পড়েছে, তার দফা রফা হয়ে গেছে। ছবিতে যে হাঙরটি দেখা যাচ্ছে, সে কী ভাবছে বলো তো? ভাবছে, 'সমুদ্রের ওপরে কত খাবার, ইশ, একবার যদি বাগে পাই!'

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

অসিত

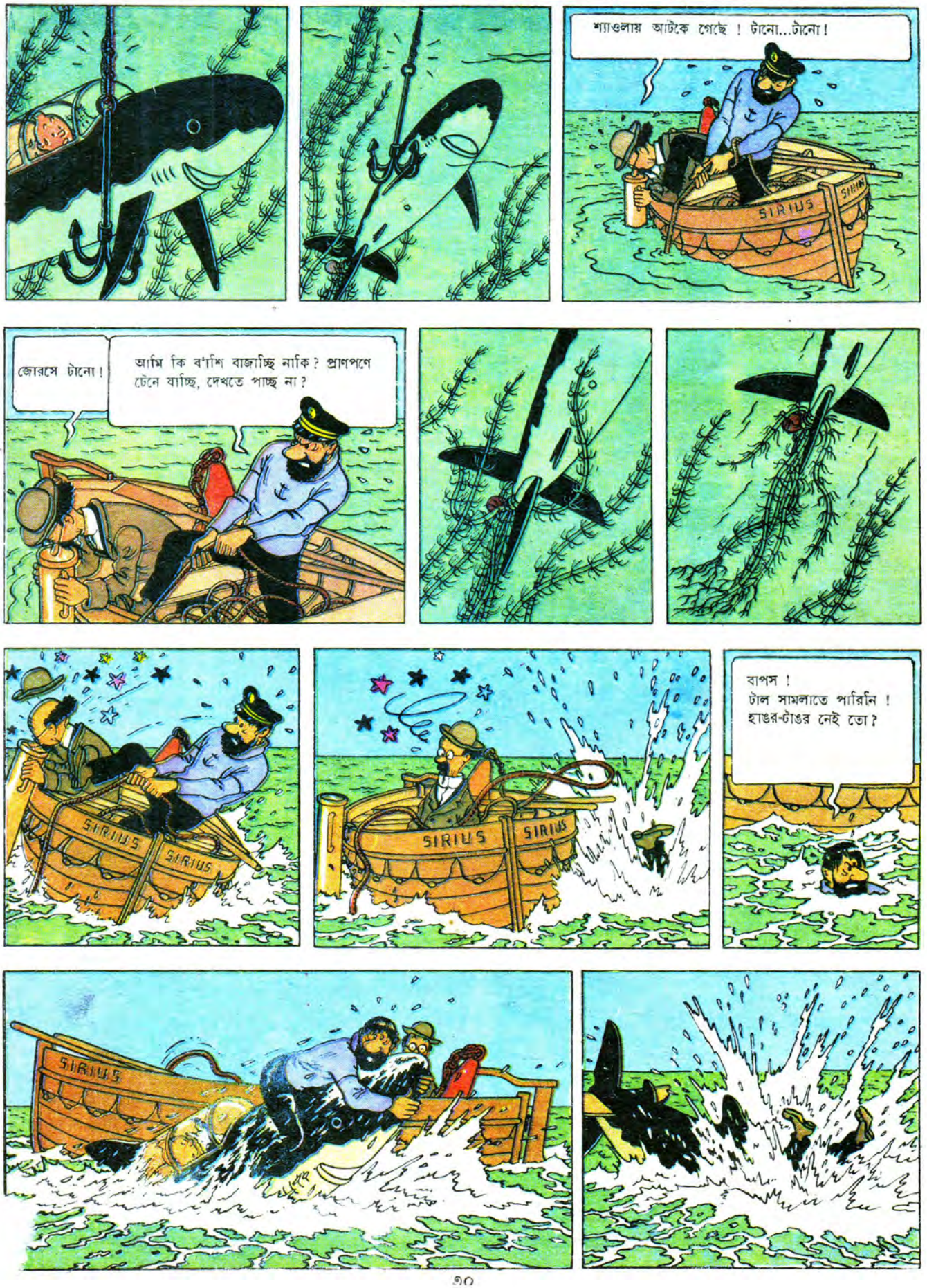
শ্যাওলায় আটকে গেছে ! টানো...টানো!
SIRIUS
জোরসে টানো!
আমি কি ব'াশি বাজাচ্ছি নাকি? প্রাণপণে টেনে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ না?
SIRIUS
SIRIUS
SIRIUS
SIRIUS
বাপস !
টাল সামলাতে পারিনি !
হাঙর-টাঙর নেই তো?
SIRIUS

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

অজগরের আদর

সঙ্কর্ষণ রায়

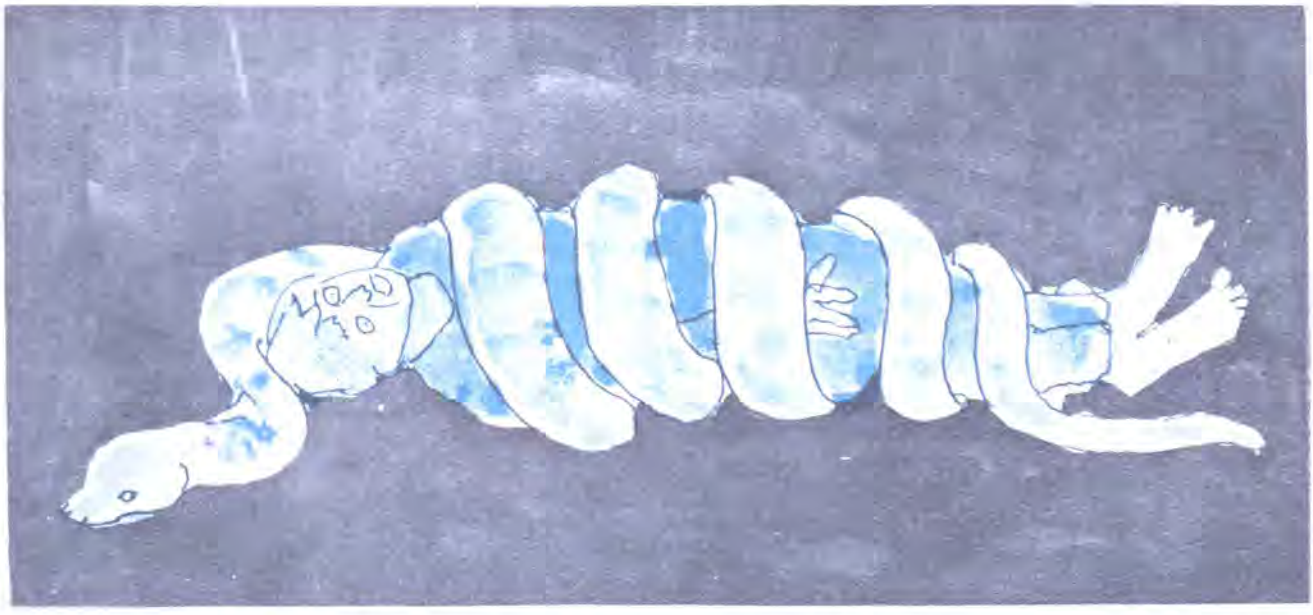

আমার ছেলে ধ্রুব পড়ছিল, 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে।' শুনে আমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল ড্রিলার ক্ষেত্রপাল সিং।

মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরির জঙ্গলে ক্যাম্প করে আমরা মাটির নীচে লুকোনো কয়লার খোঁজ নিচ্ছিলাম। মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে বলে কয়লার স্তরকে চোখে দেখার উপায় নেই, ড্রিলিং মেশিন দিয়ে মাটি ও পাথরের স্তর ফুঁড়ে তার হদিশ নিতে হয়। আমাদের ক্যাম্পে পাঁচটি ড্রিলিং মেশিন ছিল, তার মধ্যে একটি চালাত ক্ষেত্রপাল। ড্রিলিং মেশিন যে চালায় তাকে বলে 'ড্রিলার'।

পেশায় ড্রিলার, কিন্তু ক্ষেত্রপাল সিংয়ের নেশা হল সাপ পোষা। নানা ধরনের সাপ ধরে সে লোহার খাঁচায় পুরে পুষেছিল এবং কোন্ সাপ কী খেতে ভালবাসে তা নিয়ে গবেষণা করছিল। সাপ পোষার নেশার জন্য ক্যাম্পের লোকেরা তার নাম দিয়েছিল সাপ-বাবু।

"কী পড়ছ খোকাবাবু!" আমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই পরিষ্কার বাংলায় ক্ষেত্রপাল বলল, "অজগর খুবই নিরীহ জানোয়ার, খিদে না পেলে কখনোই তেড়ে আসে না।"

অজগর সাপ যে কতখানি নিরীহ ও অহিংস হতে পারে, একটা বাচ্চা-অজগর পুষে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল ক্ষেত্রপাল।

অজগর সাপের বাচ্চাটা একটা খরগোশ গিলে ক্ষেত্রপাল সিংয়ের ড্রিলিং মেশিনের কাছে লতাঝোপের আড়ালে পড়ে ছিল। আর কেউ তাকে দেখতে পায়নি, দেখতে পেলেও সাপ বলে বুঝতে পারেনি। কারণ, তাকে একটা গাছের গুঁড়ির মত দেখাচ্ছিল। কিন্তু ক্ষেত্রপালের দৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতে পারল না।

তার নজরে আসা মাত্র ড্রিলিং মেশিনের দুজন আদিবাসী মিস্ত্রির সাহায্যে অজগরের বাচ্চাটিকে ধরে ফেলল ক্ষেত্রপাল। তারপর ট্রাকের পেছনে রেখে তাকে নিয়ে এল ক্যাম্পে।

ট্রাক থেকে অজগরটাকে নামাতেই ক্যাম্পের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। ক্ষেত্রপালের তাঁবুর সামনে ভিড় করে দাঁড়াল সবাই

বাচ্চা অজগর বলতে আমি ভেবেছিলাম বুঝি ছোটখাট একটা সাপ। কিন্তু ক্ষেত্রপালের তাঁবুর সামনে গিয়ে দেখি, প্রায় দশ ফুট লম্বা রীতিমত প্রকাণ্ড একটি সরীসৃপ। দেখে আঁতকে উঠে ক্ষেত্রপালকে বলি, "এই মস্ত বড় সাপটিকে বাচ্চা বলছ!"

"বাচ্চা ছাড়া আর কী।" ক্ষেত্রপাল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, "ধাড়ি অজগর হলে প্রায় বিশ ফুট লম্বা হত।"

"কত দিনে এটা বিশ ফুট লম্বা হবে বলতে পারো?" ভয়ে-ভয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

"দু থেকে আড়াই বছর। কিন্তু যত বড় হোক, স্বভাবে ও হিংস্র নয়--ছোট সাপগুলোর মত ওর বিষ নেই।"

"কিন্তু ওর খিদে পেলে যদি ক্যাম্পের কাউকে ধরে গিলে ফেলে?"

"খিদে পেলে যাতে ও খেতে পায়, তার ব্যবস্থা করলে ক্যাম্পের কারুর ওপরেই ও হামলা করবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রায়সাহেব।"

আমি নিশ্চিন্ত থাকি বা না-থাকি, অজগরটিকে নিজের তাঁবুর পাশে রাখল ক্ষেত্রপাল। তার জন্য লোহার জাল দিয়ে ঘেরা একটা ঘরও তৈরি করল সে।

অজগরটি ক্রমে-ক্রমে ক্ষেত্রপালের পোষ মেনে যায়। ক্রমশ আমরা বুঝতে পারি যে, খিদের সময় খাদ্য পেলে তার মত নিরীহ জীব পৃথিবীতে আর হয় না।

অজগরটিকে আমরা কেউই আর ভয় পাই না, কাজেই ক্ষেত্রপাল তাকে স্বাধীনভাবে ক্যাম্পের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে দেয়। তবে বাইরের থেকে যারা আমাদের ক্যাম্পে আসে, অজগরটিকে দেখে আঁতকে ওঠে তারা। অনেকে ঐ অজগরের ভয়ে আমাদের ক্যাম্পের ধারেকাছেও আসতে চায় না। ক্যাম্পের পাহারাওয়ালাদের কাজকর্মও অনেক কমে যায় ক্ষেত্রপালের অজগরটির জন্য।

অজগরটির সঙ্গে পাশাপাশি থাকতে-থাকতে ওকে যখন আমাদেরই একজন বলে ভাবতে শুরু করেছি, তখন একদিন মাঝ-রাতে ক্যাম্পের দারোয়ান আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলল, "অজগরটা

সাপ-বাবুকে পিষে মারছে..... শিগগির আসুন!"

সঙ্গে-সঙ্গে আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে পাশের তাঁবুতে গোপীনদার ঘুম ভাঙাই। গোপীনদা আমার সহকর্মী বন্ধু, দক্ষ শিকারী বলে নাম করেছেন। তিনি তাঁর রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

আমরা দুজনে ছুটতে-ছুটতে গিয়ে পৌঁছই ক্ষেত্রপালের তাঁবুতে। তাঁবুর মধ্যে থেকে অস্পষ্ট গোঙানির মত আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। ভয়ে-ভয়ে আমরা ভিতরে ঢুকে পড়ি।

ভিতরে অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি আমার পাঁচ সেলের বড় টর্চটা জ্বালাই। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভয়াবহ দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে।

খাটের ওপরে শুয়ে থাকা ক্ষেত্রপালকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছে অজগর সাপটা। জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলছে। ক্ষেত্রপালের চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। চিৎকার করার ক্ষমতা তার নেই, শুধু একটা অবরুদ্ধ গোঙানির মত শব্দ বেরিয়ে আসছে তার গলা থেকে।

"গুলি করুন গোপীনদা!" আমি আর্ত স্বরে বলে উঠলাম, "সাপটার মাথাটা ক্ষেত্রপালের শরীর থেকে একটু তফাতে আছে, মাথাটা তাক করুন!"

"না, না।" ক্ষেত্রপাল কোনমতে গোঙাতে-গোঙাতে বলল।

গোপীনদা বললেন, "এখনই গুলি করলে সাপটা আরও জোরে জড়িয়ে ধরবে ক্ষেত্রপালকে। তারপর আর বাঁচানো যাবে না ওকে। কাজেই চেষ্টা করো যাতে সাপটা ওকে ছেড়ে দেয়। সাপটার চোখের ওপরে আলো ফেল।"

আমার হাত কাঁপছিল, কাজেই সোজাসুজি অজগরটির চোখে আলো ফেলতে পারি না। তখন গোপীনদা তাঁর টর্চ জেলে অজগরটির চোখের ওপরে আলো ফেলেন। একটুও কাঁপে না তাঁর হাত। টর্চের আলো ধাঁধিয়ে দেয় অজগরের চোখ দুটি।

আগুনের মত জ্বল-জ্বল করছে অজগরের চোখ। উত্তেজিত হয়ে উঠে সে ক্ষেত্রপালকে ছেড়ে দেয়। আর অজগরের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হওয়া মাত্র ক্ষেত্রপাল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গোপীনের উদ্দেশে বলে, "ওকে মারবেন না ব্যানার্জী সাহেব।"

অজগরটি তখন গোপীনদার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গোপীনদা তাঁর টর্চ ফেলে দিয়ে রাইফেল তুলে ধরেন। অন্ধকারের মধ্যে জ্বল-জ্বল-করতে-থাকা অজগরের চোখ দুটি লক্ষ করে গুলি করতে যাবেন গোপীনদা, এমন সময় গোপীনদার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষেত্রপাল দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাঁকে। সঙ্গে-সঙ্গে গোপীনদার হাত থেকে রাইফেলটা পড়ে যায়।

গোপীনদার হাত থেকে রাইফেল পড়ে যেতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ক্ষেত্রপাল। তারপর অজগরটাকে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে যায় তার তাঁবুর বাইরে।

এই ঘটনাটির পর ক্যাম্পের সকলে মিলে ক্ষেত্রপালকে চাপ দেয় অজগরটিকে বিদেয় করে দেওয়ার জন্য। সকলের ইচ্ছার কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয় তাকে। বৈকুণ্ঠপুরের রাজাসাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে অজগরটাকে তাঁর চিড়িয়াখানায় রাখার বন্দোবস্ত করে।

বৈকুণ্ঠপুরের রাজাসাহেবের চিড়িয়াখানায় অজগরটিকে পৌঁছে দিয়ে মনমরা হয়ে পড়ে ক্ষেত্রপাল। কারও সঙ্গে কথা বলে না, চুপচাপ শুয়ে থাকে তার বিছানায়।

ক্ষেত্রপালকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একদিন তার তাঁবুতে গেলাম আমি ও গোপীনদা। গোপীনদা বললেন, "মন খারাপ করছ কেন ক্ষেত্রপাল, ও তো তোমাকে পিষে মারতে গিয়েছিল।"

"না, ব্যানার্জীসাহেব।" ক্ষেত্রপাল কাতর স্বরে বলল, "ও আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরেছিল শুধু। এর আগেও দু-একবার অমন করেছে।"

"আদর করে জড়িয়ে ধরেছিল শুধু?" গোপীনদার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এর আগেও তোমাকে কীরকম আদর করেছিল জানি না, কিন্তু এবারে যা দেখলাম, তাকে তো নিছক আদর বলে মেনে নিতে পারছি না! ও রকম আদর আর বেশিক্ষণ চললে দম আটকে মারা পড়তে তুমি। অজগরের আদর কি মানুষের সয় ভাই। কাজেই ওকে যে বিদেয় করে দিয়েছ, সেটাই হয়েছে বুদ্ধির কাজ।"

ছবি সুধীর মৈত্র

ফুস মন্তর

অশোককুমার মিত্র

একটি ভালুক শালুক খেতে
তিনটে তালুক ছাড়িয়ে,
যেমনি গেছে বনের মাঝে,
অমনি গেল হারিয়ে!
কন্ধকাটা গন্ধ শুঁকে
যেই দাঁড়াল পথ জুড়ে,
উবে গেল অমনি হাওয়ায়—
যেন বেবাক কপ্পুর-এ!
আবার দ্যাখো, সিন্ধু-ঘোটক
মঞ্চে সবে দাঁড়াল।
মুণ্ডুখানা নাড়বে কি না
ভাবতে-ভাবতে হারাল।
টাট্টুঘোড়া এই এখনি
ঘোরাচ্ছিল লাট্টুকে
কই গেল সে, কেউ দেখেনি,
সটকে গেছে কোন্ ফাঁকে!
হাস্নুহানার লম্বা ডানায়
রং চিত্তির জমকালো,
তিরপুর্নির ঘাটের ধারে
যেই মাত্তর থমকাল,
অমনি ফুড়ুত! কোথায় গেল?
শুধুই মনের ধন্দ রে
ঘটছে সবই ভেলকিওলার
কারসাজি ফুস্ মন্তরে!

ছবি অনুপ রায়

(একত্রিশের পাতার পর)

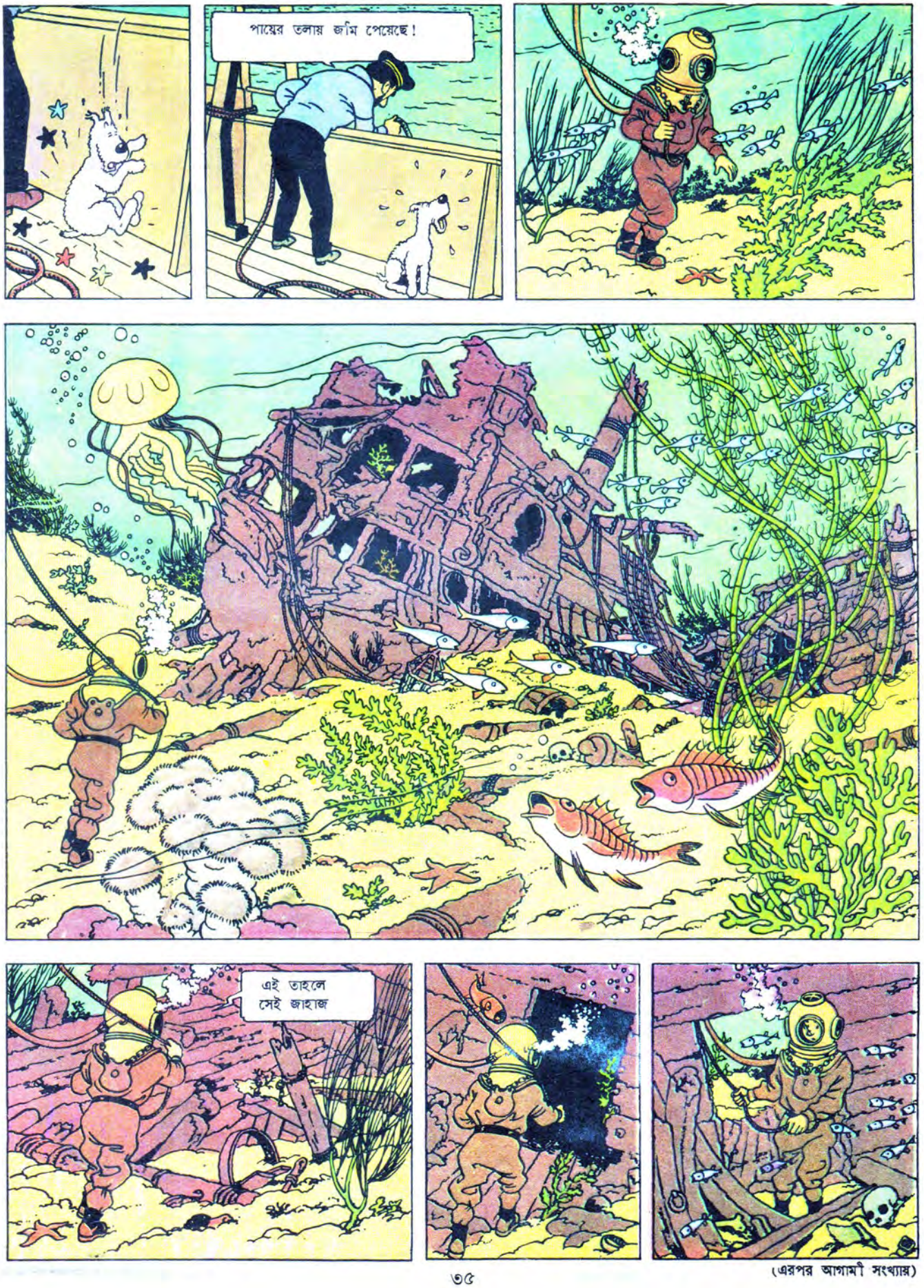

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

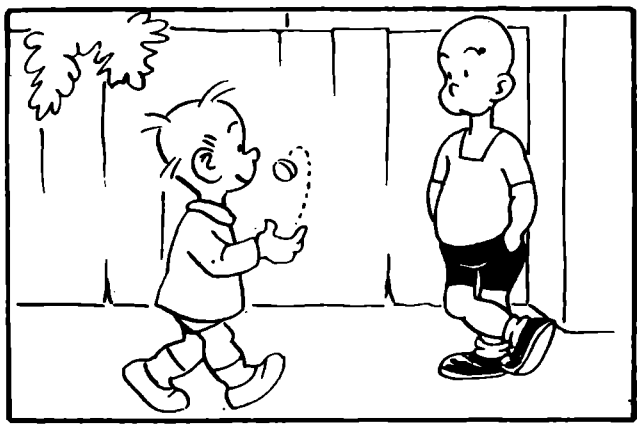

স্বাগতম

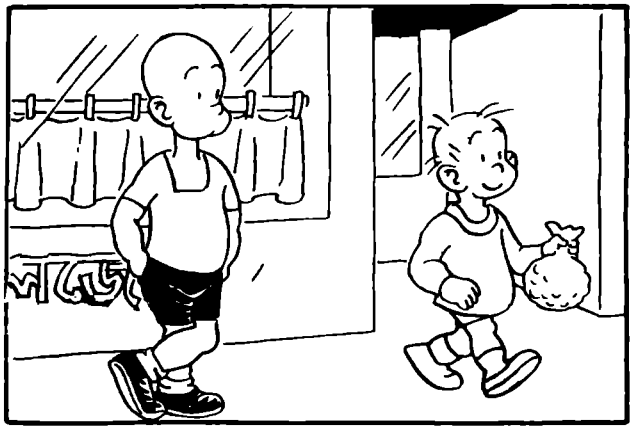

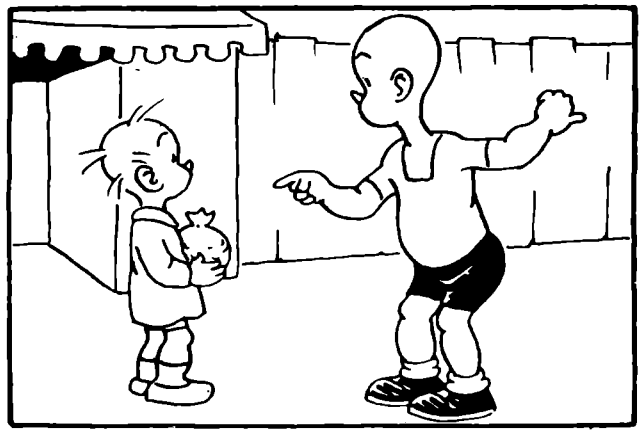

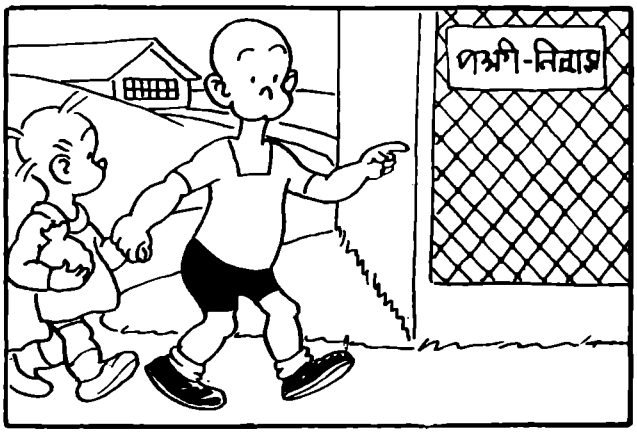
পাখি-নিবাস

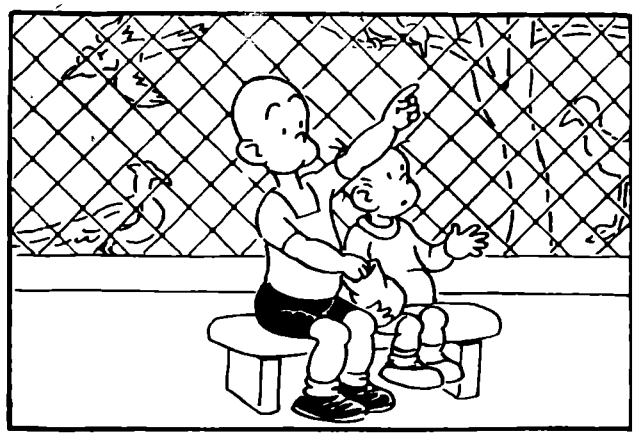

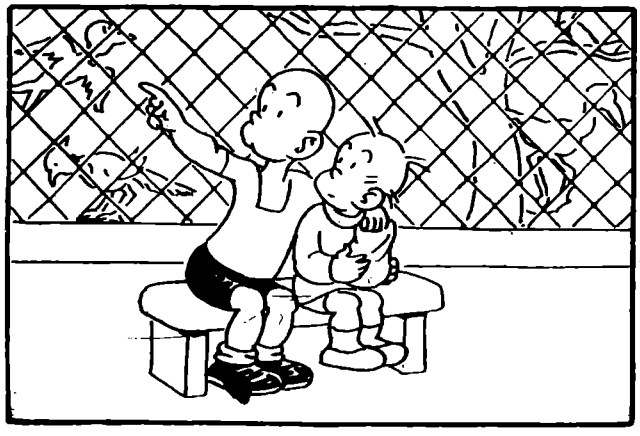

উঃ গাবলুদা, অনেক পাখি তুমি চিনিয়ে দিয়েছ!

উপন্যাস

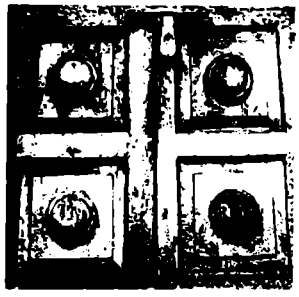

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

সমরেশ বসু

আগে যা ঘটেছে

দুদিন আগে গোগোল ইস্কুল থেকে বাড়ি এসে, ডাবুদার হারিয়ে যাবার খবর শোনে ওর মায়ের কাছে। ডাবুদা ইস্কুলে যায়, আর ফিরে আসেনি। তার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল। পরের দিনই জানা গিয়েছিল, ডাবুদাকে ডাকাতরা চুরি করেছে। আর সেই ডাকাতরা ডাবুদার বাবাকে টেলিফোন করে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। একদিকে যখন এই ঘটনা, তখন গোগোল ছত্তলার মহেশানিদের বন্ধ-দরজা ফ্ল্যাটের মধ্যে নানা রকম শব্দ শুনতে পায়। ও জানত মহেশানিরা সবাই দিল্লি চলে গিয়েছেন, তাঁদের কাজের লোক চান্দা সিং একলা ফ্ল্যাটে ছিল। কিন্তু কলিং বেল বাজিয়েও গোগোল কারও সাড়াশব্দ পায়নি। এদিকে একটা সন্দেহজনক লোককে গোগোল সারা বিল্ডিংয়ের ওপরে-নীচে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিল। পরে জেনেছিল, লোকটা নাকি চান্দা সিংয়ের মামা। দু ঘণ্টা ধরে সে মহেশানিদের ফ্ল্যাটে খুঁজে পাচ্ছিল না, এটা কি সম্ভব? পরের দিন গোগোল ইস্কুল থেকে ফিরে মহেশানিদের বন্ধ দরজার ইয়েল লকের ছিদ্রে আবার উঁকি দিয়ে দেখেছিল। আশ্চর্য। ও দেখেছিল, ডাবুদা ঘরের ভিতর বসে আছে। তা কি কখনো সম্ভব? ও আবার লকের ছিদ্রে উঁকি দিয়েছিল। দিতেই হঠাৎ দরজা খুলে গিয়েছিল। আর দরজার পর্দাটাই যেন হাত হয়ে ওকে ভিতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ওর মুখ হাত পা বাঁধা হয়েছিল। গোগোল বুঝেছিল, চান্দা সিং আর তার সেই ছদ্মবেশী মামা, যার নাম জৈল সিং, তারাই আসলে ডাকাত। ডাবুদাকেও সে ভিতরে দেখতে পেয়েছিল। ডাবুদা গোগোলকে চোখের ইশারা আর সুযোগ বুঝে দু-এক কথায় জানিয়ে দিয়েছিল, পালাতে হবে। তারপরে ডাবুদার হাতে দুধ খেয়ে গোগোল অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই ঘুম ভাঙে রাত্রে একটা চলন্ত খোলা ট্রাকে। ডাবুদাই ওর ঘুম ভাঙিয়েছিল। বলেছিল, আসলে সে-ই চান্দা সিংয়ের সঙ্গে প্ল্যান করে লন্ডন যাবার জন্য হারিয়ে গিয়েছিল। অন্যায়টা তারই, কারণ পরে বুঝেছিল, চান্দা সিং তাকে মিথ্যা বলেছে আসলে তারা ছেলে-ধরা ডাকাত। ডাবুদা গোগোলের হাত-পা-মুখের বাঁধন খুলে দিয়েছিল, যেন গাড়ি একটু আস্তে হলেই গোগোল পালিয়ে যেতে পারে। সেই সময়েই একটা চেকপোস্টে ট্রাক থামাতে হবে বলে, চান্দা সিং গোগোলকে একটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দিয়েছিল। চেকপোস্টে চেক করার পরেই যখন ট্রাক ছাড়তে যাবে, গোগোল ট্রাকের পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করল, "এই গাড়িটা আটকান, এটা ডাকাতের গাড়ি।" ট্রাক আরো জোরে ছুটে বেরিয়ে গেল। চেকপোস্ট থেকে জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মিঃ মজুমদার। কিন্তু সামনের চেকপোস্টে গিয়ে শোনা গেল, অমন কোনো ট্রাক ওদিকে যায়নি। তাহলে কি ট্রাক নিয়ে পথের পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে ডাকাতরা? তারপর—

॥ ১৫ ॥

পিছনের জীপে যে মিঃ তেওয়ারি আসছেন, গোগোল তা বুঝতে পারল। পিছন ফিরে পরিষ্কার দেখতে না পেলেও অনুমান করল, মিঃ তেওয়ারি জীপের সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশেই বসে আছেন। পিছনে রয়েছে রাইফেলধারী সেপাই। গোগোলদের জীপ চলেছে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে। মিঃ তেওয়ারির জীপ আসছে কিছুটা ডাইনে চেপে। এর একটাই উদ্দেশ্য। রাস্তার দু দিকেই লক্ষ রাখা। সামান্য ফারাক রেখে, হেডলাইট জেবলে, দুটো জীপই চলেছে আস্তে-আস্তে। অনেকটা যেন শিকারী কুকুরের মতো, দেখতে-দেখতে, শুঁকতে-শুঁকতে চলেছে। কিন্তু ডাউন আর আপে লরি ট্রাক চলাচলের জন্যে মিঃ তেওয়ারির জীপ প্রায়ই বাঁ দিকে চেপে আসছে। গোগোলদের জীপও প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ছে। এখন আর চলমান কোন লরি বা ট্রাককেই দাঁড় করানো হচ্ছিল না।

এইভাবে প্রায় দু কিলোমিটারের মতো রাস্তা চলার পরেই মিঃ তেওয়ারির স্বর শোনা গেল, "মিঃ মজুমদার!"

গোগোলরা সকলেই চমকে উঠল। কারণ, সকলের অপলক সজাগ দৃষ্টি ছিল রাস্তার ধারের দিকে। মিঃ তেওয়ারির ডাক শুনে, ফটিক জীপ দাঁড় করিয়ে দিল। দেখা গেল, পনর বিশ গজ পিছনে, রাস্তার ডান দিকে মিঃ তেওয়ারির জীপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। হেডলাইটের তীব্র আলোর জন্য গোগোল মিঃ তেওয়ারিকে দেখতে পেল না, তাঁর গলা আবার শোনা গেল, তিনি ইংরেজিতে বললেন, "মিঃ মজুমদার, ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে ট্রাকের চাকার দাগ চলে গেছে, আর দাগ দেখে মনে হচ্ছে, ট্রাকটা ডাউন থেকে আপে এসে, ভেতরে ঢুকে পড়েছে।"

গোগোলের পাশ থেকে মিঃ মজুমদার স্বর চড়িয়ে বললেন, "তা হলে আমাদের ওই দাগ ধরেই জঙ্গলে ঢোকা উচিত। আপনি ঢুকে পড়ুন, আমি আপনাকে ফলো করছি।"

মিঃ তেওয়ারি কিছু বলবার আগেই, গোগোলদের জীপের ড্রাইভার ফটিক মিঃ মজুমদারকে বলল, "স্যার, সামনে তাকিয়ে দেখুন, কয়েক হাত দূরেই, আমাদের বাঁ দিকেও, জঙ্গলের মধ্যে ট্রাকের চাকার দাগ চলে গেছে!"

মিঃ মজুমদারের সঙ্গে গোগোলও, গলা তুলে সামনে ঝুঁকে দেখল সত্যি ট্রাকের চাকার দাগ যেন জঙ্গলের সুড়ঙ্গের মধ্যে চলে গিয়েছে। মিঃ মজুমদার বললেন, "তাই তো দেখছি। তবে এ চাকার দাগ যেন আপ থেকে ডাউনে যেতে গিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।"

ফটিক বলল, "তা অবিশ্যি ঠিক স্যার। কিন্তু এমন তো হতে পারে, ডাকাতরা সামনে বেগতিক দেখে, ট্রাক ঘুরিয়ে এনে এদিকে ঢুকে গা ঢাকা দিয়েছে?"

মিঃ মজুমদার বললেন, "হুঁ, তুমি যা বলছ, তাও হতে পারে। তা হলে মিঃ তেওয়ারিকে ওদিকে পাঠিয়ে, আমাকে এদিকে ঢুকে দেখতে হয়।" বলেই তিনি পিছন ফিরে ডান দিকে তাকালেন।

মিঃ তেওয়ারির জীপ তখন ডান দিকের জঙ্গলে এগোতে আরম্ভ করেছে। মিঃ মজুমদার চিৎকার করে ডাকলেন, "মিঃ তেওয়ারি!"

এক ডাকেই মিঃ তেওয়ারির জীপ থেমে গেল, আর তাঁর স্বর শোনা গেল, "মিঃ মজুমদার কিছু বলছেন?"

মিঃ মজুমদার জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। আমাদের বাঁ দিকের জঙ্গলের চোরা পথেও দেখছি, ট্রাকের দাগ ভেতরে ঢুকে গেছে। তাই বলছি, আপনি ওদিকে ঢুকুন, আমি এদিকে ঢুকছি। যদি আসল ট্রাক বা ডাকাতদের দেখা পান, বন্দুকের আওয়াজ করবেন। আমি পেলেও করব, তখন যোগাযোগ হবে।"

মিঃ তেওয়ারির স্বর ভেসে এল, "ঠিক আছে।"

গোগোলের উত্তেজনা চরমে উঠল। এরকম ঘটনা যে ওর জীবনে ঘটতে পারে, কখনো ভাবেনি। নিজের জন্য এখন ওর মনে কোন ভয় নেই। ডাবুদার জন্যই উদ্বেগ হচ্ছে। কিন্তু এরকম অচেনা জায়গায়, রাত্রে জঙ্গলে ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করা, এটাই ওর আসল উত্তেজনা। ওদের জীপ সামনে একটু এগিয়ে, বাঁ দিকে ট্রাকের চাকার দাগ লক্ষ করে, জঙ্গলের ভিতরে ঢুকল। গোগোল বুঝতে পারছিল না, জঙ্গলের ভিতরে গাড়ি চলবে কেমন করে। ও অবাক হয়ে দেখল হেডলাইটের আলোয়, জীপটা যেন একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলল।

আরও অবাক হয়ে দেখল, ট্রাকের চাকার দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ও মিঃ মজুমদারকে না জিজ্ঞেস করে পারল না, "জঙ্গলের মধ্যে কি রাস্তা আছে?"

মিঃ মজুমদার বললেন, "আমরা তো জঙ্গলের রাস্তা দিয়েই চলেছি। এটা অবিশ্যি চোরা পথ। কাঠের জন্য গাছ কাটতে, বড় বড় লরি ট্রাক যাবার পথও আছে। এ ছাড়া আশে-পাশে আরো অনেক সরু পথ আছে, যার ভেতরে জীপ ঢুকতে পারে।"

মিঃ মজুমদারের কথা শেষ হতে-না-হতেই, ড্রাইভার ফটিক জীপ দাঁড় করিয়ে দিল, আর হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে বলল, "কিসের একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে।"

হেডলাইট নিভিয়ে দিতেই, গোগোলের মনে হল, অন্ধকার যেন মিশমিশে কালো হাত বাড়িয়ে গিলতে আসছে। ও মিঃ মজুমদারের আরও কাছ ঘেঁষে বসল, আর শুনতে পেল, একটু দূর থেকে খট-খট শব্দ ভেসে আসছে। কয়েক মুহূর্ত, কারো মুখেই কোন কথা নেই। জীপের এঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে, ঝিঁঝিঁর ডাকের সঙ্গে ভেসে আসছে খট-খট শব্দ। মিঃ মজুমদার বললেন, "শব্দটা যেদিক থেকে আসছে, সেদিকেই চলো।"

ফটিক তৎক্ষণাৎ হেডলাইট জ্বালিয়ে, গাড়ি চালিয়ে দিল। খটখট শব্দটার সঙ্গে চান্দা সিং বা জৈল সিংয়ের ডাবুদাকে নিয়ে পালাবার কী যোগাযোগ থাকতে পারে, গোগোল বুঝতে পারল না। জীপটা এঁকেবেঁকে, শুকনো পাতা মড়মড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ গোগোলের চোখে পড়ল, একটা লরি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর বুকটা ধক করে উঠল! চান্দা সিংদের সেই ট্রাক নাকি? তারপরেই হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল, দুটো লোক কুড়োল দিয়ে একটা বড় গাছের গোড়া কোপাচ্ছে। তাদের সামনে একটা ছোট লণ্ঠন জ্বলছে। আরও দুজন লোক কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেডলাইটের আলো তাদের গায়ে পড়তেই, কুড়োল হাতে লোক দুটো থমকে গেল, আর জীপটাকে তাদের দিকে এগোতে দেখে লোক দুটো কুড়োল হাতেই দৌড় দিল। বাকি লোক দুটো তখনো জীপের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মিঃ মজুমদার চিৎকার করে বললেন, "তোমরা কারা, এত রাত্রে গাছ কাটছ? তোমরা কি ঠিকাদার?"

একটা লোক জবাব দিল, "হ্যাঁ। আপনি কে?"

মিঃ মজুমদার বললেন, "আমি যে-ই হই, তোমাদের ঠিকা-দারি লাইসেন্স দেখব আমি।" বলেই তিনি হুকুম দিলেন, "কিষেণ সিং, এদের পাকড়াও করো তো।"

মিঃ মজুমদারের কথা শেষ হতে না হতেই, লোক দুটো দুদিকে দৌড় লাগাল। ড্রাইভার ফটিক হেসে উঠে বলল, "এরা চুরি করে গাছ কাটতে এসেছে। আপনাকে চিনতে পেরেই পালিয়েছে।"

মিঃ মজুমদার বললেন, "তা কি আমি বুঝতে পারিনি ভেবেছ? লাইসেন্সধারী ঠিকাদার কখনো এত রাত্রে মাত্র দুটো লোক নিয়ে গাছ কাটতে আসে না। চলো তো, লরিটা একবার দেখি।"

ড্রাইভার ডান দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে লরির কাছে এগিয়ে গেল। গোগোলের কাছে সব ব্যাপারটাই ধাঁধার মতো। দেখল, লরিটাতে দু তিনটে বড়-বড় গাছ কেটে তোলা হয়েছে। ড্রাইভার ফটিক বলল, "স্যার, লরিটা মনে হচ্ছে ঝাড়গ্রামের লক্ষ্মণ দাসের।"

ফটিকের কথা শেষ হতে না হতেই দুবার গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ ভেসে এল। মিঃ মজুমদার বলে উঠলেন, "ফটিক, শিগগির ফিরে চল। গাছ-চোরদের ব্যবস্থা পরে হবে। মিঃ তেওয়ারি বোধহয় সেই ডাকাতদের সন্ধান পেয়েছেন।"

ফটিক তৎক্ষণাৎ জীপ ঘুরিয়ে, বড় রাস্তার দিকে ছুটে চলল। গোগোলের বুকে যেন ঢাক বাজতে লাগল। মিঃ তেওয়ারি কি চান্দা সিংদের ধরতে পেরেছেন? তা নইলে বন্দুকের শব্দ হবে কেন? জীপ বড় রাস্তা পার হয়ে উল্টো দিকের জঙ্গলে ঢুকল। মিঃ মজুমদার বললেন, "বন্দুকের শব্দ কোন দিক থেকে এল?"

ফটিক জবাব দিল, "বুঝতে পারছি না। তবে এদিককার জঙ্গল থেকেই শব্দ হয়েছে।"

ঠিক এই সময়েই শোনা গেল, কারা যেন বাঁ দিকে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। পিছন থেকে কিষেণ সিং, বাঁ দিকে টর্চের আলো ফেলল। সেই দিকে তাকিয়ে গোগোল চিৎকার করে উঠল, "ওই যে চান্দা সিং আর জৈল সিং ডাবুদাকে নিয়ে পালাচ্ছে।"

গোগোল ভুল দেখেনি। দেখা গেল, গাছপালার ভিতর দিয়ে চান্দা সিং আর জৈল সিং ডাবুকে দুদিক থেকে দু হাত ধরে ছুটছে। ফটিক বাঁ দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে গাছপালা বাঁচিয়ে ছুটল। মিঃ মজুমদার কোমরের খাপ থেকে রিভলবার বের করে নিলেন। বললেন, "কিষেণ সিং, বন্দুক আর টর্চ নিয়ে নেমে পড়ো।"

বলে, তিনিও চলন্ত জীপ থেকে রিভলবার হাতে, বাইরে লাফিয়ে পড়লেন। বললেন, "গোগোল, তুমি চুপ করে বসে থাকো।"

পিছন থেকে কিষেণ আর যাদবও রাইফেল হাতে লাফিয়ে নামল। ফটিক তখন জীপ নিয়ে চান্দা সিংদের অনেক কাছে গিয়ে পড়েছে।

মিঃ মজুমদার চিৎকার করে বললেন, "তুমলোগ্ রোক্ যাও, নহি তো হম গুলি চালায়েগা।" বলে চান্দা সিংদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

চান্দা সিং আর জৈল সিং ডাবুকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফটিকও গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। হেডলাইটের আলো চান্দা সিংদের ওপরে। গোগোল আঁতকে উঠে দেখল চান্দা সিংয়ের হাতে একটা রিভলবার। রিভলবারের মুখটা সে ডাবুদার

আগামী সংখ্যা থেকে

আশাপূর্ণা দেবীর

জমজমাট উপন্যাস

একটি ভুতুড়ে কুকুর

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে

বুকের ওপর চেপে ধরে মিঃ মজুমদারকে বলল, "সাব হুঁশিয়ার! আপ গোলি চালায়েগা তো পহলেই হম ডাবুকো খতম কর দেগা।"

মিঃ মজুমদার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাত তুলে কিষেণ আর যাদবকে বললেন, "দাঁড়াও।" বলে তিনি চান্দা সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডাবুকে খতম করলে, তোমাদেরও আমি খতম করব। তোমরা আগে ডাবুকে ছেড়ে দাও।"

চান্দা সিং আর জৈল সিং যে ভয় পেয়েছে, তাদের চোখ মুখ চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ডাবুদার মাথাটা নুয়ে পড়েছে। তার জামা আর প্যান্টে ধুলো বালির দাগ। চান্দা সিং বলল, "আপনার কথা আমি রাখব সাব্, ডাবুকে আমি ছেড়ে দেব। লেকিন আমাদের চলে যেতে দিতে হবে।"

মিঃ মজুমদার অপলক চোখে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড যেন কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, তোমাদের আমি ছেড়ে দিচ্ছি ডাবুকে তোমরা ছেড়ে দাও।"

গোগোলের পাশ থেকে ড্রাইভার ফটিক বলে উঠল "তেওয়ারিজি তাঁর গাড়ি আর সেপাইদের নিয়ে কোথায় গেলেন?"

সত্যিই তো! গোগোলের মনেও প্রশ্নটা জাগল। মিঃ তেওয়ারিই যদি বন্দুকের শব্দ করে থাকেন, তা হলে এ সময়ে তিনি কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেলেন? তিনি তাড়া না করলে চান্দা সিংরা এভাবে পালাচ্ছিলই বা কেন? ডাবুদাকে পেলেই গোগোল খুশি, তবু ওর মনটা আফশোসে ভরে উঠছে। মিঃ মজুমদার ডাকাত দুটোকে ছেড়ে দিচ্ছেন?

চান্দা সিং বলল, "ডাবু এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা চলে যাবার আগে ও নড়লেই আমি গুলি চালাব। আপনারাও কেউ নড়বেন না, যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন।"

মিঃ মজুমদার বললেন, "ঠিক আছে। আমরা কেউ নড়ব না, ডাবু এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, তোমরা চলে যাও।"

চান্দা সিং ডাবুর বুকের ওপর থেকে রিভলবার তুলে, মিঃ মজুমদারের দিকে তাগ করে, জৈল সিংকে নিয়ে আস্তে-আস্তে পিছু হটতে লাগল। পিছু হটতে হটতে, তাদের দুজনের মূর্তি যখন প্রায় ছায়ার মতো অদৃশ্য হতে চলেছে, তখনই হঠাৎ কী ঘটে গেল, বোঝা গেল না। কেবল একটা হুংকার ভেসে এল "হাত উঠাও।"

তারপরই দুম্ করে একটা গুলির শব্দ, আর শুকনো পাতার ওপর দাপাদাপির আওয়াজ। মিঃ মজুমদার রিভলবার হাতে সেদিকে ছুটে যেতে-যেতে ডাকলেন, "কিষেণ, যাদব, তোমরা

এসো। মিঃ তেওয়ারি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ফটিক তুমি গাড়ি নিয়ে এসো।"

মিঃ মজুমদার কিষেণ আর যাদবকে নিয়ে ছুটলেন। ফটিক গাড়ি চালিয়ে একেবারে ডাবুর সামনে গিয়ে বলল, "উঠে এসো।"

ডাবু লাফ দিয়ে জীপে উঠে গোগোলের পাশে বসে, ওকে জড়িয়ে ধরল। গোগোলও ডাবুদাকে জড়িয়ে ধরল, আর হেড-লাইটের আলোয় দেখা গেল, চান্দা সিং আর জৈল সিংকে মিঃ তেওয়ারির সেপাইরা দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধছে। মিঃ তেওয়ারির দু হাতে দুটো উদ্যত রিভলবার। তার মধ্যে একটা যে চান্দা সিংয়ের, তা বোঝাই যাচ্ছে। মিঃ মজুমদার কিষেণ আর যাদবকে নিয়ে ঘিরে ফেললেন। মিঃ তেওয়ারি ইংরেজিতে বললেন, "বুঝলেন মিঃ মজুমদার, ডাকাত দুটো ট্রাক চালিয়ে ভাগবার চেষ্টা করছিল। তারপরে আমি যখন সামনে গিয়ে পড়লাম, ওরা ডাবুর বুকে রিভলবার ধরে, ট্রাক থেকে নেমে পালিয়েছিল। তখনই আমি বন্দুকের শব্দ করে, আপনাকে জানিয়ে দিই। তারপরে ওদের পেছন তাড়া করে এদিকে আসতে গিয়েই, আপনাদের দেখতে পেলাম। আমরা দূরে থেকেই জীপের আলো নিভিয়ে, এঞ্জিন বন্ধ করে, পা টিপে-টিপে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।"

মিঃ মজুমদার বললেন, "আমিও আপনাদের ছায়া দেখতে পেয়েছিলাম। সেইজন্যেই ডাবুকে রেখে, ওদের আমি চলে যেতে দিয়েছিলাম। জানতাম, আপনি সদলবলে পিছনে বাঘের মতো ওত পেতে আছেন।"

এই সময়েই মিঃ তেওয়ারির জীপ হেডলাইট জ্বালিয়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। মিঃ তেওয়ারি সেপাইদের হুকুম দিলেন, "ডাকু দোনোকো গাড়ি পর উঠাও, চেকপোস্ট মে চলো।"

মিঃ মজুমদার বললেন, "আপনি চলুন মিঃ তেওয়ারি, আমি আপনার পেছনে যাচ্ছি।"

পরের দিন সকালবেলা একটা বড় ভ্যানের পিছনে চান্দা সিং আর জৈল সিংকে হাত-পা বেঁধে তোলা হল। তাদের অবস্থা দেখে তখন গোগোলের খুব করুণ লাগছিল, হাসিও পাচ্ছিল। মিঃ মজুমদার গোগোল আর ডাবুকে নিয়ে সামনে বসলেন। ড্রাইভার ফটিকই গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসল। কিষেণ আর যাদব রাইফেল নিয়ে ভ্যানের পিছনে গিয়ে বসল। গাড়ি যাত্রা করল কলকাতার দিকে।

মিঃ মজুমদার গোগোলের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "গোগোল, তোমার জন্যই তোমার ডাবুদাকে বাঁচানো গেল, ডাকাত দুটোও ধরা পড়ল। অবিশ্যি ডাবুও কাল রাত্রে, ট্রাকে তোমার হাত-পায়ের দড়ি খুলে দিয়ে সাহায্য করেছিল।" বলে তিনি ডাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডাবু, তুমি যত দুষ্টু, তার চেয়ে অনেক বেশি বোকা। তা নইলে এরকম একটা কাণ্ড ঘটত না।"

গোগোল ডাবুদার দিকে তাকাল। ডাবুদা হাসল, কিন্তু তার চোখে জল এসে পড়ল। গোগোল ডাবুদার একটা হাত টেনে ধরল। ডাবুদা গোগোলের একটা হাত নিজের বুকে চেপে ধরল।

ভ্যান দ্রুত বেগে বম্বে রোড দিয়ে কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে।

(শেষ)

ছবি সমীর সরকার

ঝন্টু মন্টুর কথোপকথন

চিত্র – পরাগ রায়
বয়স – ১২ বছর

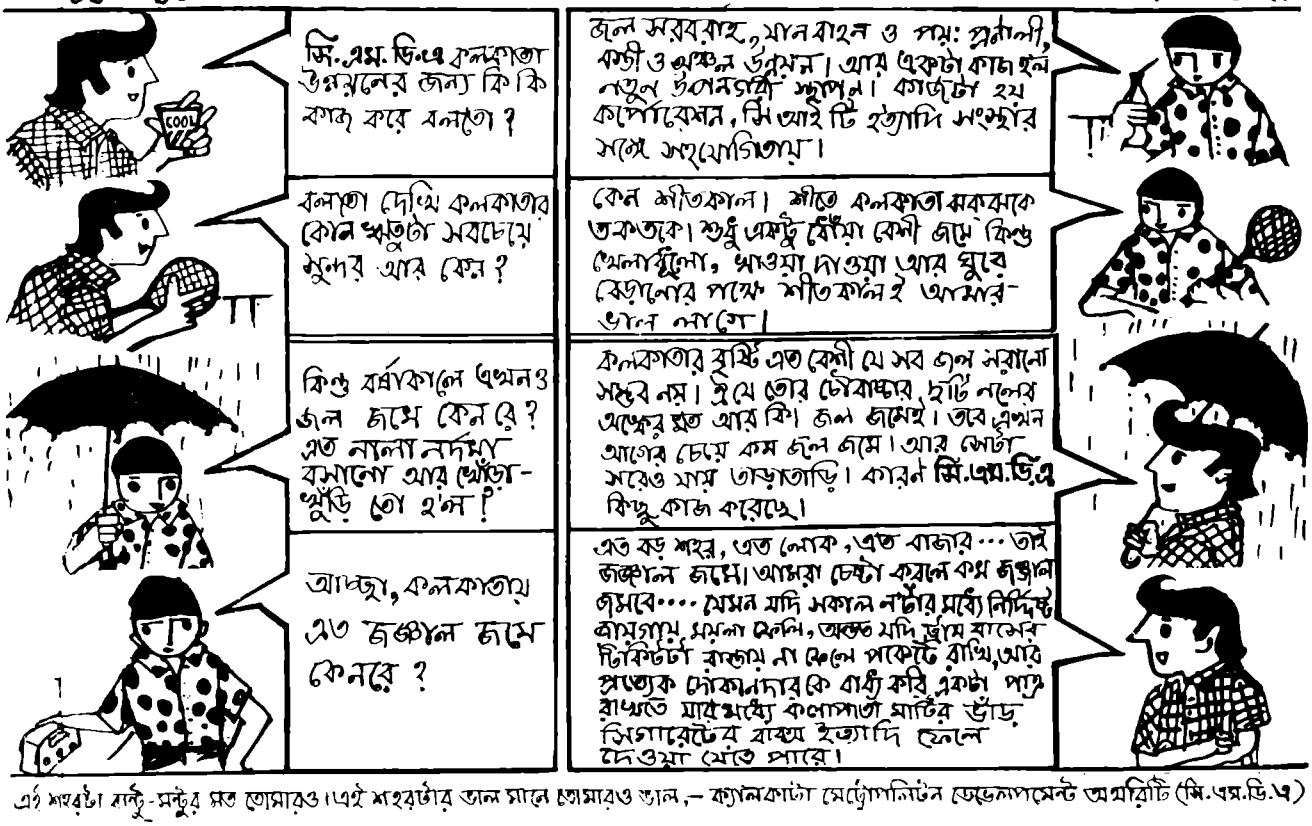

এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুর মত তোমারও। এই শহরটার ভাল মানে তোমারও ভাল,— ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

স্বাস্থ্য নিয়ে হেস্তনেস্ত

কুন্তক

দুলতে দুলতে একটা কবিতা পড়ছিল টুম্পি, মুখস্থ করবারই চেষ্টা করছিল বোধহয়। হঠাৎ থেমে গিয়ে শুকনো গলায় বলে উঠল : দাদা, তোর কেমন সব মুখস্ত থাকে, আমার কেন থাকে না রে?

তবে? ভাবিস কী আমায়? দুবার পড়লেই মুখস্ত হয়ে যায় আমার।

ঠিক সেই সময়ে দুমদাম করে ঘরে ঢুকলেন বৌদি। বললেন : এদের নিয়ে আর পারি না আমি। টুম্পি, ফের দুধ ফেলে চলে এসেছ? আমার কি সারাদিন তোমাদের পিছনে পিছনে দৌড়ে বেড়ানোই কাজ?

দুধের গ্লাসটা জোর করে হাতে গুঁজে দিয়ে গজগজ করতে করতে বৌদির প্রস্থান : যত বড় হচ্ছে, তত নষ্টামি বাড়ছে!

একটু অপদস্থ ভাবে বসে রইল টুম্পি।

বললাম : খেয়ে নে খেয়ে নে। গায়ে জোর হবে।

ছাই হবে।

হবে হবে। নন্তু খেয়েছিস?

আমি? নাঃ। আমার আর জোরের দরকার নেই। আমার কি স্বাস্থ্য খারাপ দেখছ?

দেখছি না, শুনছি।

সে আবার কী? স্বাস্থ্য আবার শোনে কী করে?

টুম্পি হেসে ফেলল। বলল : স্বাস্থ্য শুনছ?

টক করে দুধটা খেয়ে নে। তাহলে বলব স্বাস্থ্য কেমন করে শোনে। খেয়ে নাও তো লক্ষ্মী।—বাঃ। এইবার গায়ে একটু জোর-জোর লাগছে না? এইবার বল তো মুখস্থ।

হয় নি যে এখনো ভাল করে।

আহা, আমি কবিতাটা মুখস্থ বলতে বলছি না। মুখস্থ শব্দটাকেই বলতে বলছি।

নন্তু বলল : এই রে! কী যেন আবার প্যাঁচ হয়েছে একটা।

টুম্পি একটু ভয়ে ভয়ে বলল : মুখস্ত।

ওই তো! আরেক গ্লাস দুধ খেতে হবে তোমায়। শব্দটা মুখস্ত নয় রে, মুখস্থ। মানে, মুখে যা আছে। স্থ-লাগানো এ-রকম অনেক শব্দই শুনেছিস। শুনিস নি? দেখ্ তো একটু ভেবে।

দুজনে মিলে গম্ভীর হয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর নন্তু ঘোষণা করল : দুধ খেতে আমি একেবারেই অভ্যস্থ নই।

ভেবে এই বার করলি? অভ্যস্থ বলিস নাকি তুই?

বলি তো অভ্যস্ত। কিন্তু তুমি হয়ত বলবে সেটা গায়ে জোর নেই বলে।

তা কেন বলব? বললে তুই শুনবিই বা কেন? ওই শব্দ থেকে স্থ-টা বাদ দিলে কী বাকি থাকে, দেখ্ তো ভেবে।

বাদ দিলে? থাকে অভ্য।

অভ্য মানে কী?

নেই কিছু? সভ্যভব্য ধরনের কিছু হবে না?

তোমার মাথা হবে। যে শব্দের শেষে স্থ হয়, সেখানে দেখবি ওটা ছেড়ে দিলেও একটা মানে পেয়ে যাবি।

পেয়ে যাব? স্বাস্থ্য। স্থ ছাড়লে রইল স্বা। কী হল মানে?

স্থ তো ছাড়লি না। ছাড়লি যে স্থ্য। সুস্থ থেকে স্বাস্থ্য হয়েছিল। সুস্থ-র স্থ ছাড়, রইল সু। উলটো যেমন দুঃস্থ। কিংবা, ধর, অন্তঃস্থ।

কাকু, গৃহস্থ?

হ্যাঁ, গৃহস্থও হবে। থাকার ব্যাপারটা থাকলেই হল। স্থান একটা চাই।

যেমন হিন্দুস্থান পাকিস্থান।

এখানে আবার আরেকটা মুশকিল আছে। হিন্দুস্থান বলতেও পারিস, কিন্তু পাকিস্থান আসলে পাকিস্তান। ওখানে একটা ফারসি মূল আছে, ঠিক 'স্থান' নয়। গুলিস্তান যেমন, ফুলের জায়গা। ইকবালের সেই গানের লাইনটা জানিস, সারে জহাঁসে ?

সারে জহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা !

হ্যাঁ, এইখানেও আর স্থান রইল না, হয়ে গেল স্তান। তবে, আমরা হিন্দু-স্থানও বলি, সেই নজিরে পাকিস্থানও বলি।

আর, অভ্যস্ত হল কী করে তবে ?

ওটা একেবারেই অন্য জিনিস। শব্দটা তো হল অভ্যাস। তার সঙ্গে জুড়ে দে 'ক্ত' প্রত্যয়। হল অভ্যস্ত। গ্রাস থেকে—কী হবে গ্রাস থেকে? গ্রস্ত। দুর্দশাগ্রস্ত। গ্রস্থ নয়। এই ভুলটা সবাই খুব বেশি করে।

তাহলে তো আমি বলব মুখোশ থেকে মুখস্ত।

বললে আর আটকাচ্ছে কে! কিন্তু গণ্ডগোল, 'ক্ত' প্রত্যয়টাকে যে-কোনো জায়গায় লাগিয়ে দিলেই তো হল না। গ্রাস, ন্যাস, অভ্যাস, ত্রাস, আশ্বাস—লক্ষ করছিস, এর সবকটারই মধ্যে আছে একটা কাজের ব্যাপার? তাই গ্রস্ত ন্যস্ত অভ্যস্ত ত্রস্ত আশ্বস্ত, আর অন্যদিকে মুখস্থ গৃহস্থ সুস্থ দুঃস্থ বহিঃস্থ অন্তঃস্থ।

আচ্ছা তাহলে অন্তস্তল না অন্তঃস্থল ?

বিসর্গের কথা ভুলে গেছিস বুঝি? যদি তলের কথা বলিস তাহলে অন্তস্তল, যদি স্থলের কথা বলিস তো অন্তঃস্থল।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, একদিকে রোগারা, অন্যদিকে মোটারা। বেশ, হয়ে যাক স্বাস্থ্য নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত। মা, দাও দেখি এক গ্লাস দুধ।

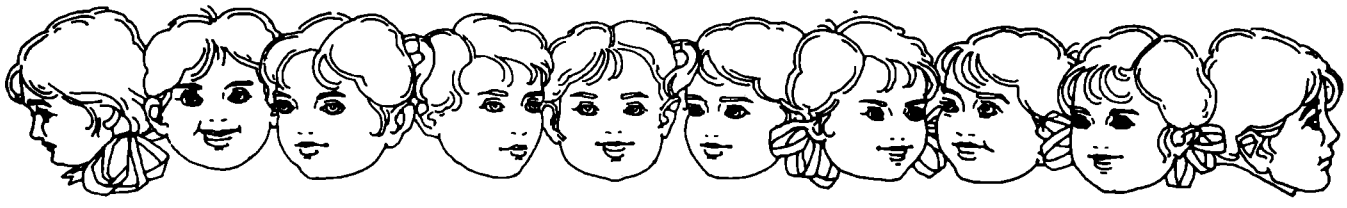

সহজে ইংরেজি

কথাবার্তা চলছে

চামেলির ইস্কুলের বাস এখনো আসেনি। ইতিমধ্যে ওদের কথাবার্তার খানিকটা আমরা শুনে নিই ঃ

Mr. Roy : Are you eating your breakfast, Molly ?

Molly : No, Father. I've finished. I'm speaking to Mother.

Mrs. Roy : Are you eating your breakfast, Chambal ?

Chambal : Yes, Mother. Where is the cat ?

Molly : Ara is there; she's under the table.

কথা চলুক, তার মধ্যে আমরা বাক্যের গঠনগুলো একটু লক্ষ করে দেখি ঃ

Molly *goes* to school.

Araballi *loves* milk.

Mr. Roy *reads* the newspaper in the morning.

Mrs. Roy *cooks* the breakfast.

আবার দেখো ঃ

Molly and Chambal *go* to school.

All cats *love* milk.

Mr. and Mrs. Roy *send* their children to school.

তার মানে, একজনের, কথা বলতে গেলে ঃ

goes, loves, reads, cooks.

আর, একজনের বেশি যদি হয়, তাহলে ঃ

go, love, read, cook, send.

তেমনি আবার ঃ

Mrs. Roy *is reading* a letter.

Araballi *is having* her milk.

Chameli and Chambal *are eating* their breakfast.

All the Roys *are* in their dining-room.

এবারে তোমাদের পালা। নীচের প্রত্যেকটা বাক্যের শেষে বন্ধনীর মধ্যে দুটি করে শব্দ আছে। তার একটি দিয়ে বাক্যটির ফাঁক ভর্তি করো।

Chambal — football. (play|plays)

Chameli — to dance. (love|loves)

They — in a small house. (live|lives)

Chambal — to school. (walk|walks)

সর্বশেষে একটা খেলা হোক। তুমি যদি ছেলে হও, মনে করো তুমি চম্বল ; যদি মেয়ে হও, মনে করো তুমি চামেলি। তারপর নিজের কথা যা-যা জেনেছ লেখো। আরম্ভ করো এই ভাবে ঃ

I am Chambal. | I am Chameli.

তারপর লিখে যাও।

প্রসাদ

দুঃসাহসিক অভিযান

লিভিংস্টোন

ডেভিড লিভিংস্টোনের জন্ম হয়েছিল স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো শহরের কাছে ছোট একটা গ্রামে। তিনি বড় হয়ে একটা সুতো কলে কাজ পান। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। মিশনারি হিসেবে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছিল। ১৮৪১ সালে ২৮ বছর বয়েসে তিনি আফ্রিকার মিশনারি ডাক্তার হিসেবে যান। আফ্রিকায় এসে তিনি স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। এই সময় তিনি ৮ বছর ধরে কালাহারি মরুভূমি পার হওয়ার একটা পরিকল্পনা নেন। ১৮৪৯ সালে দুজন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কালাহারি মরুভূমি জয় করার অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। ১৮৪৯ সালের ১ অগাস্ট তিনি কালাহারি মরুভূমি পার হয়ে একটা হ্রদের ধারে পৌঁছে যান। ১৮৫১ সালে তিনি আফ্রিকার মধ্যভাগে জাম্বেসি নদী আবিষ্কার করেন।

১৮৫৩ সালে তিনি আফ্রিকার কয়েকটি অজানা জায়গা পার হয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত একটা রাস্তা খুঁজে বার করার চেষ্টায় অভিযান চালান। ১৮৫৪ সালে কঙ্গো নদীর উপত্যকায় এসে পৌঁছলেন। খাবারদাবার প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। পথে লিভিংস্টোনের দারুণ জ্বর হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর দলবল নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে এসে পৌঁছলেন। এর পর তিনি জাম্বেসি নদীর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন। এইভাবে লিভিংস্টোন অজানা আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যভাগকে মানুষের চোখের সামনে নিয়ে এলেন।

১৮৫৮ সালে তিনি আর একটা অভিযান চালালেন। জাম্বেসি নদীর উৎস খুঁজে বার করলেন তিনি। ১৮৫৯ সালে আফ্রিকার হ্রদগুলি খুঁজে বার করার জন্যে একটা অভিযান চালানো হয়। তিনি নায়াসা হ্রদ এবং নায়াসাল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন।

১৮৬৬ সালে অভিযান শুরু হয় জাঞ্জিবার থেকে। লিভিংস্টোন নায়াসা, ট্যাঙ্গানিকা প্রভৃতি হ্রদের ধারে এসে পৌঁছলেন। তারপর নীল নদের উৎসের সন্ধানে উজিজি পর্যন্ত যান। তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল, সঙ্গের রসদও ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রায়। এই সময়ে লিভিংস্টোনের ইংল্যাণ্ডের বন্ধুরা অনেক দিন তাঁর খোঁজ খবর না পেয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা লিভিংস্টোনের খোঁজে স্ট্যানলিকে আফ্রিকায় পাঠালেন। উজিজিতে স্ট্যানলির সঙ্গে লিভিংস্টোনের দেখা হয়। স্ট্যানলি এতকাল পরে লিভিংস্টোনকে দেখে চমকে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "লিভিংস্টোন আই প্রিজিউম।"

লিভিংস্টোন সুস্থ হয়ে উঠলে স্ট্যানলি দেশে ফিরে গেলেন। লিভিংস্টোন গেলেন না, নীল নদের উৎস খুঁজে বার করার জন্যে আফ্রিকাতেই রয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে লিভিংস্টোন আবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন সকালে তাঁর কুঁড়েঘরে প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে মৃত অবস্থায় দেখা গেল তাঁকে। স্থানীয় অধিবাসীরা অনেক চেষ্টা করে তাঁর মৃতদেহ ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেন। ১৮৭৪ সালে তাঁর মৃতদেহ লণ্ডনে ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবেতে সমাহিত করা হয়।

দিদিমণি

লোডশেডিং ম্যাজিক

পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

ম্যাজিকটার নাম শুনে তোমরা নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছ। ভাবছ এটা নিশ্চয়ই একটা বিরক্তিকর ম্যাজিক। কারণ লোডশেডিং জিনিসটাই জঘন্যরকম, তার ম্যাজিক তো বাজে হবেই। তাই না? ঠিক কথা। লোডশেডিং আমার মোটেই ভাল লাগে না এবং ম্যাজিকের মধ্যিখানে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেলে আরও খারাপ লাগে। আজকের এই ম্যাজিকটার নাম লোডশেডিং হলেও এটা কিন্তু লোডশেডিংয়ের ম্যাজিক নয়। আসলে লোডশেডিংয়ের মধ্যে এই খেলাটা আমায় দেখাতে হয়েছিল বলেই এর নাম দিয়েছি আমি লোডশেডিং ম্যাজিক।

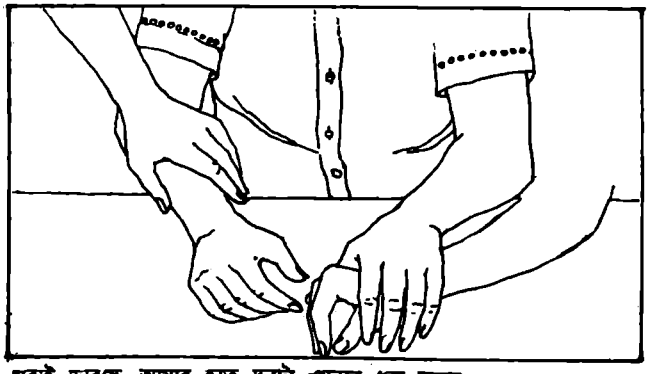

সবাই ভাবছে, আমার হাত দুটো এভাবে ধরা আছে

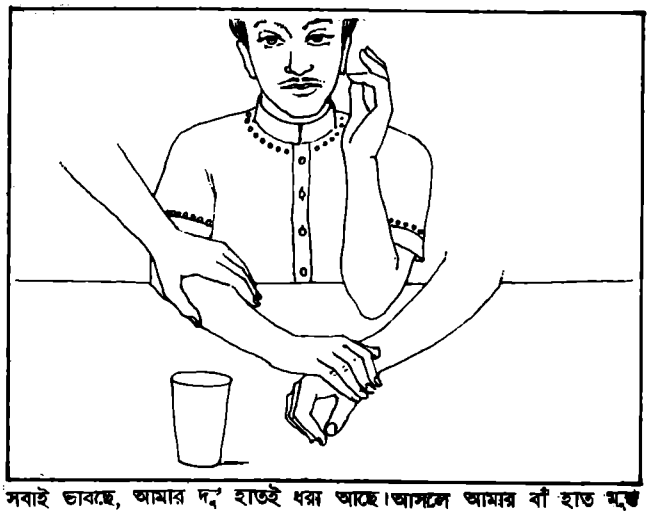

সবাই ভাবছে, আমার দু' হাতই ধরা আছে।আসলে আমার বাঁ হাত মুক্ত

এই কয়েকদিন আগে আমার কয়েকজন বন্ধু এসে ধরেছিল ম্যাজিক দেখাবার জন্য। ওদের খুশি করতে এক প্যাকেট তাস বের করে যেই না ম্যাজিকটা শুরু করতে যাব, এমন সময় সেই বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপারটা ঘটে গেল। ঘচাং করে লোডশেডিং হয়ে গেল। ম্যাজিক তো দেখার জিনিস—লাইট না জ্বললে লোকে দেখবে কী করে? আর এমনই দুর্ভাগ্য, হাতের কাছে একটাও মোমবাতি খুঁজে পেলাম না। অন্ধকারের মধ্যে একজন ফস করে বলে উঠল, "প্রদীপদা আপনি তো কতোরকম ম্যাজিক দেখান, তা এই অন্ধকারেই একটা ম্যাজিক দেখান না।" আমি হেসে বললাম, "দেখাতে পারি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে তো?" বাঁ পাশ থেকে একজন আবার বলে উঠল, "এমন ম্যাজিক দেখান যেটা না দেখেও বোঝা যায়।"

ভাল বলেছে কথাটা। সবাই আমায় চেপে ধরল ঐ জাতীয় একটা ম্যাজিক করবার জন্য। আর আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। এই অন্ধকারে কী করা যায়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল। বললাম, "ভূতের ম্যাজিক দেখবে?" সবাই তো মহাখুশি। "হ্যাঁ হ্যাঁ, ভূতের ম্যাজিক হোক"—একসাথে সবাই চেঁচিয়ে বলে উঠল; আর তার সাথেই একটু ঘেঁষে এসে বসল আমার কাছে।

আমি বললাম, "দ্যাখো এই ম্যাজিকটা মোটেই ভয়ের কিছু নয় কারণ ভূতটা খুব নিরীহ, আর শুধু তা নয়, ও এতই ভিতু যে, তোমাদের ভয়ে এখানে নাও আসতে পারে। তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি প্রতিজ্ঞা করো যে, ওকে মারবে না বা বকবে না তাহলে কিন্তু আমি ওকে এখানে এনে মজার মজার কাজ করাতে পারি।"

ভিতু ভূতের কথা শুনে বন্ধুরা তো খুব খুশি। আমি বললাম "তোমাদের কেউ যদি ভুল করে মেরে বসো, বা ওকে হাত দিয়ে ধরতে যাও, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভাল হবে না। তার থেকে একটা কাজ করা যাক, আমরা সবাই একজন অন্যজনের হাত ধরাধরি করে বসে থাকি, তাহলে অনেক নিশ্চিত হওয়া যায়। কেউ কিন্তু কারুর হাত ছেড়ো না, শক্ত করে ধরে থেকো। এই যেমন ধরো আমার ডাইনে যে আছ, সে তার বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাতটা ধরো, আর ডান হাত দিয়ে ওপাশের ছেলেটার বাঁ হাত ধরো। আমি আমার বাঁ হাত দিয়ে আমার বাঁ পাশে বসা বন্ধুর ডান হাতটা ধরছি, এবং সে যেন তার বাঁ হাত দিয়ে তার পাশের জনের ডান হাতটা ধরে। এই ভাবে সবাই মিলে ডান হাত-বাঁ হাত ধরাধরি করে শেকলের মতো বসে থাকি। সবাই শক্ত করে হাত ধরে থাকবে, কেউ কারুর হাত ছাড়বে না, সব্বার হাত যেন ধরা থাকে।"

ব্যাপারটা সবাইকে বুঝিয়ে আমরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে বসে পড়লাম। সবাই শক্ত করে একে অন্যের হাত ধরে আছে। আমি তখন গম্ভীর গলায় বলতে লাগলাম, "শান্ত ভূত চলে এসো, আমরা হাত ধরে বসে আছি। তুমি এসে আমায় বুঝিয়ে দাও যে, তুমি এখানে এসেছ।"

এইভাবে কয়েকবার বলতেই শুরু হল অবাক কাণ্ডকারখানা। আমাদের সবার মাঝখানে রাখা ছিল একটা কাচের গ্লাস, কিছু কাগজ আর কলম-পেন্সিল। পেন্সিলটা হঠাৎ গ্লাসের গায়ে ঠকাঠক ঠকাঠক করে আওয়াজ করতে শুরু করল। আমরা কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তবে পরিষ্কার বুঝতে পারছি কে যেন পেন্সিলটা নাড়িয়ে-নাড়িয়ে আওয়াজ করছে। আর শুধু তা নয়, কাগজটা তুলে সবার গায়ে আলতো করে ছুঁইয়ে আবার স্বস্থানে রেখে দিল। বলা বাহুল্য, আমরা কেউই করছি না, কারণ সবারই তো হাতগুলো শক্ত করে ধরা। সবাই অবাক হবার চেয়ে ভয় পেয়েছিল বেশি।

তোমরাও নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছ, ভাবছ এটা কী করে সম্ভব? ভূতটুত তো বাজে কথা, কিন্তু তাহলে ওগুলো হচ্ছিল কী ভাবে? আসলে ব্যাপারটা ভীষণ সহজ। পুরো ব্যাপারটা আমিই করছিলাম। পাশাপাশিভাবে একজন অন্যজনের হাত ধরা থাকলেও আমার বাঁ হাতটা কিন্তু মোটেই ধরা ছিল না। আমার ডান দিকের জন তার বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাতের কবজির একটু ওপরটা শক্ত করে ধরেছিল। আর আমি বাঁ হাত দিয়ে আমার বাঁ দিকের লোকের ডান হাতটা ধরবার নাম করে আসলে আমার ডান হাত দিয়েই ধরেছিলাম। আমার ডান হাতটাই শুধু বন্দী ছিল, বাঁ হাত ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং ঐ ভৌতিক কাজকর্মগুলো করতে আমার মোটেই অসুবিধা হয়নি। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারবে।

লোডশেডিংয়ের মধ্যে ম্যাজিকটা করে দেখো, দেখবে সত্যি-সত্যিই ভুতুড়ে ব্যাপার বলে সবাই ভাবছে!

বিশ্বকাপের খেলায়

মুকুল দত্ত

ফোটো অমিয় তরফদার

বিশ্বকাপ ফুটবলে জয় নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে কেমন টাই-ব্রেকার লড়াই চলছে দ্যাখো। আগে অবশ্য ইউরোপের ইতালি এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল উপর্যুপরি দুবার জয়ী হয়েছে। কিন্তু উনিশশো বাষট্টি থেকে একবার পাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার দল, একবার পাচ্ছে ইউরোপের দল। বাষট্টিতে জিতল ব্রাজিল, ছেষট্টিতে ইংল্যান্ড, সত্তরে আবার ব্রাজিল, চুয়াত্তরে পশ্চিম জার্মানি। এবার আর্জেন্টিনা। আবার চার বছর পরে স্পেনে যখন খেলা হবে তখন হয়ত জিতবে ইউরোপের কোনো দল। ফুটবলে কারা শ্রেষ্ঠ—দক্ষিণ আমেরিকা, না ইউরোপ—এ প্রশ্নের যেন সমাধান হচ্ছে না। আগের দশটি প্রতিযোগিতায় দুই গোলার্ধের দেশ পাঁচবার করে জিতেছে। এবার নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ জিতল ছয়বার। একাদশ সংখ্যাটি তো বিজোড় সংখ্যা। সুতরাং টাই-ব্রেকারে এক গোলার্ধ এগিয়ে থাকবেই।

ফুটবলে কোন্ দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তা যেমন প্রমাণ হয়ে যায় বিশ্বকাপের খেলায়, তেমন প্রমাণ হয় কাদের ফুটবলের মান বেশি উন্নত। দক্ষিণ আমেরিকার? না, ইউরোপের?

আর্জেন্টিনা এবার বিশ্বকাপ জেতায় এবং একটি খেলাতেও না হেরে ব্রাজিল তৃতীয় স্থান পাওয়ায় ফুটবলের রাজা পেলে বলেছেন, "প্রমাণ হয়ে গেল, দক্ষিণ আমেরিকাই ফুটবলে শ্রেষ্ঠ।" পেলেকে নিয়ে সারা পৃথিবী গর্ব করলেও তিনি তো দক্ষিণ আমেরিকারই লোক। একটি চমৎকার কথা কিন্তু বলেছেন দক্ষিণ আমেরিকার আর এক ফুটবল বিশারদ এবং বিজয়ী আর্জেন্টিনা দলেরই ম্যানেজার-কোচ সিজার লুই মিনোত্তি। বলেছেন, "দক্ষিণ আমেরিকা ফুটবলে শ্রেষ্ঠ একথা প্রমাণ হল কীভাবে? আমরা তো ইউরোপের অনেক দলের সঙ্গে খেলিনি। তবে এটা অবশ্যই প্রমাণ হয়েছে যে, আমরা লড়তে জানি।"

সত্যি কথাই বলেছেন মিনোত্তি। এই আর্জেন্টিনা দলকেই তো প্রথম পর্যায়ের খেলায় ইতালির কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। রানার্স হল্যান্ডও প্রথম পর্যায়ের একটি খেলায় হেরেছে স্কটল্যান্ডের কাছে, যে স্কটল্যান্ড দ্বিতীয় ধাপে উঠতে পারেনি। যেখানে সমানে সমানে লড়াই, কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেখানে কোন্ দিন কোন্ দল জেতে তার কি ঠিক আছে? খেলোয়াড়রা তো যন্ত্র নয়। কোটি টাকা দামের খেলোয়াড়রাও সবদিন সমান খেলতে পারেন না। ফাইনালে যে হল্যান্ডকে ৩—১ গোলে হারিয়ে আর্জেন্টিনা সর্বপ্রথম বিশ্বকাপ জয় করল, হয়ত দেখা যাবে, ওই হল্যান্ডের কাছেই হেরে যাবে, আর্জেন্টিনা দশ মাস পরে। হ্যাঁ, আগামী মে মাসে জুরিখে ফিফার ৭৫তম বার্ষিক উৎসবে আবার এই দুটি দলের খেলা হবে।

এবার একটি ব্যাপার কিন্তু আবার প্রমাণ হয়ে গেল। কী ব্যাপার বলো তো? দেশের মাঠে দেশের হাজার-হাজার সমর্থকের সামনে খেলার একটা বাড়তি সুবিধা আছে। আর্জেন্টিনা নিজেদের দেশের খেলায় সে সুবিধা নিশ্চয়ই পেয়েছে। আগেও এই সুবিধা পেয়ে বিশ্বকাপ জিতেছে উরুগুয়ে, ইতালি, ইংল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানি। আমি বলছি না, দেশের মাঠে খেলা না হলে এরা জিততে পারত না। হয়ত জিতত। কিন্তু দেশের মাঠে কিছু সুবিধা পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আর্জেন্টিনার সুবিধাটাও দ্যাখো। চেনা মাঠ, লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন তো ছিলই, তার উপর ফাইনালে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি

ফাইনালের একটি উত্তেজনাময় মুহূর্ত (হল্যান্ড গোল খেয়েছে)

আর্জেন্টিনার বার্তোনি (ফাইনালে গোল দিয়েছিলেন)

ফাইনালের আর একটি দৃশ্য

আরও একটি (বলের দখল নেবার জন্য লড়াই চলেছে)

রাজপথে বিজয়োল্লাস

পেরুর সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়ে অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝে নিল কিছুটা হাল্কা মনে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ ম্যাচটি জিতে ফাইনালে খেলার সমান সুযোগ ছিল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার। তাই ব্রাজিলের ম্যানেজার-কোচ ক্লডিও কুটিনহো বলেছিলেন, তাদের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের এবং আর্জেন্টিনার সঙ্গে পেরুর ম্যাচ দুটি স্টেডিয়ামে একই সময়ে আরম্ভ হওয়া উচিত, যাতে খেলার ফল গড়াপেটা করার কোন সুযোগ না থাকে। তা কিন্তু হয়নি। আগে হয়েছে ব্রাজিল আর পোল্যাণ্ডের ম্যাচ। ব্রাজিল ৩—১ গোলে পেল্যাণ্ডকে হারিয়ে ভেবেছিল যে, আর্জেন্টিনা চার গোলের ব্যবধানে পেরুকে হারাতে পারবে না। ফাইনালে খেলার সুযোগ পাওয়ার জন্যে আর্জেন্টিনার চারটি গোল করার প্রয়োজন ছিল। পরে ম্যাচ খেলে পেরুর বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা করল ছয়টি গোল। ফাইনালে খেলার অধিকার পেয়ে গেল আর্জেন্টিনা।

ফল দেখে এবং টেলিভিশনে খেলা দেখে গর্জে উঠলেন কুটিনহো এবং ব্রাজিলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা। বললেন, "ফুটবলের উপর এটা দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাসঘাতক পেরু ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে গা লাগিয়ে খেলেনি।"

আবার হল্যাণ্ডের বদলে ইতালি ফাইনাল খেলতে পারত, যদি গ্রুপের শেষ ম্যাচে হল্যাণ্ড তাদের কাছে হেরে যেত। ইতালি প্রথমার্ধে দারুণ খেলে এবং বিরতির সময় পর্যন্ত ১—০ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত হেরে যায় ২—১ গোলে। তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলাতে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করেও ইতালি হেরে গেছে। কিছুটা ভাগ্যদোষেই। তাদের দুর্দান্ত দুটি শট এবং একটি হেড করা বল গোল পোস্ট ও ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। টেলিভিশনে হয়ত দেখে থাকবে। তাহলে দ্যাখো যে কোনো দলই জিততে পারত। আর্জেন্টিনা ও হল্যাণ্ডের বদলে ফাইনাল খেলতে পারত ব্রাজিল ও ইতালি, সত্তর সনে যেমন খেলেছিল মেকসিকোতে। সেবারই তো আগের ট্রফি, সোনার পরীটি বরাবরের জন্য জিতে নেয় ব্রাজিল। ইতালিও নিতে পারত। পারেনি।

সোনার পরীর বদলে নতুন ফিফা বিশ্বকাপটিকে কী বলব? সোনার পৃথিবী? সোনায় তৈরি ট্রফিটি তো পৃথিবীরই প্রতীক। ৩৬ সেণ্টিমিটার উঁচু দণ্ডের উপর পৃথিবীটি যেন বসানো রয়েছে। তৈরি করেছেন ইতালির শিল্পী সিলভিয়ো গাজানিগার। কেমন মজা দ্যাখো, পৃথিবীর প্রতীকটি গোল, ফিফার প্রতীকে পাশাপাশি আঁকা পৃথিবীর দুই গোলার্ধ। আবার ফুটবলও গোল। গোল বলের এই খেলা নিয়ে কী ভীষণ গণ্ডগোলও। ফাইনাল খেলার আগে হল্যাণ্ড দল তো মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। কারণ, প্লাস্টার-বাঁধা-হাত নিয়ে রেনে কারকফের খেলায় যোগদানের ব্যাপারে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ডেনিয়েল পাসারেলা আপত্তি করেছিলেন। কারকফের ভাঙা হাতে প্লাস্টার ছিল। ওতে অপর খেলোয়াড়দের বিপদ ঘটার আশঙ্কায় আপত্তি। অনেক তর্ক বিতর্কের পরে ইতালির রেফারী আরজিও গনেলা প্লাস্টার খুলে ফেলতে বলেন। শেষ পর্যন্ত হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে কারকফ খেলতে নামেন। তার জন্য খেলা আরম্ভ হয় নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পরে।

জানো নিশ্চয়ই, এই রেনে কারকফ আর উইলি কারকফ যমজ ভাই। দুজনই হল্যাণ্ডের দারুণ খেলোয়াড়। একজন চার বছর আগে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ফাইনালে কিছুক্ষণ খেলেছিলেন, রেনসেনব্রিঙ্কের পরিবর্ত হিসাবে। কে খেলছেন, সাংবাদিকরা বুঝে উঠতে পারেননি। দুজনকেই দেখতে একরকম। খেলার পদ্ধতিতেও মিল, রেকর্ডে শুধু লেখা আছে ভ্যানডার কারকফ। ওদের পুরো নাম উইলি ভ্যানডার কারকফ ও রেনে ভ্যানডার কারকফ।

গ্রুপ–১

	ইতালি	আর্জেন্টিনা	ফ্রান্স	হাঙ্গারি
ইতালি		১—০	২—১	৩—১
আর্জেন্টিনা	০—১		২—১	২—১
ফ্রান্স	১—২	১—২		৩—১
হাঙ্গারি	১—৩	১—২	১—৩	

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
৩	৩	০	০	৬	২	৬
৩	২	০	১	৪	৩	৪
৩	১	০	২	৫	৫	২
৩	০	০	৩	৩	৮	০

যাঁরা গোল করেছেন। ইতালির পক্ষে : রোসি ও জাকারেলি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে; রোসি, বেগেটো ও বেনেটি হাঙ্গারির বিরুদ্ধে; বেগেটো আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। **আর্জেন্টিনার পক্ষে :** লুক ও বার্তোনি হাঙ্গারির বিরুদ্ধে; পাসারেলা (পেনাল্টি) ও লুক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। **ফ্রান্সের পক্ষে :** ল্যাকোঁবে ইতালির বিরুদ্ধে; প্লাটিনি আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে; লোপেজ, রসেটু ও বারদলি হাঙ্গারির বিরুদ্ধে। **হাঙ্গারির পক্ষে :** স্যাপো আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে; টথ (পেনাল্টি) ইতালির বিরুদ্ধে; জম্বরি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে।

গ্রুপ–২

	পোল্যাণ্ড	পঃ জার্মানি	টিউনিসিয়া	মেক্সিকো
পোল্যাণ্ড		০—০	১—০	৩—১
পঃ জার্মানি	০—০		০—০	৬—০
টিউনিসিয়া	০—১	০—০		৩—১
মেক্সিকো	১—৩	০—৬	১—৩	

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
৩	২	১	০	৪	১	৫
৩	১	২	০	৬	০	৪
৩	১	১	১	৩	২	৩
৩	০	০	৩	২	১২	০

যাঁরা গোল করেছেন। পোল্যাণ্ডের পক্ষে : লাটো টিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে; বোনিয়েক-২ ও দেনা মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। **পঃ জার্মানির পক্ষে :** রুমেনিগ-২, ফ্রোহে-২, ডিটার মুলার, হ্যান্স মুলার মেক্সিকোর বিরুদ্ধে; **টিউনিসিয়ার পক্ষে :** আলি কাবি, গোমিদ, দাউইব মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। **মেক্সিকোর পক্ষে :** ভাসকোয়েজ (পেনাল্টি) টিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে; রানজেল পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে।

গ্রুপ–৩

	অস্ট্রিয়া	ব্রাজিল	স্পেন	সুইডেন
অস্ট্রিয়া		০—১	২—১	১—০
ব্রাজিল	১—০		০—০	১—১
স্পেন	১—১	০—০		১—০
সুইডেন	০—১	১—১	০—১	

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
৩	২	০	১	৩	২	৪
৩	১	২	০	২	১	৪
৩	১	১	১	২	২	৩
৩	০	১	২	১	৩	১

যাঁরা গোল করেছেন। অস্ট্রিয়ার পক্ষে : শাকনার ও ক্রাঙ্কল স্পেনের বিরুদ্ধে; ক্রাঙ্কল (পেনাল্টি) সুইডেনের বিরুদ্ধে। **ব্রাজিলের পক্ষে :** রিনাল্ডো সুইডেনের বিরুদ্ধে; রবার্টো অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। **স্পেনের পক্ষে :** ড্যানি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে; জুয়ন এসেনসি সুইডেনের বিরুদ্ধে। **সুইডেনের পক্ষে :** জোয়েবার্গ ব্রাজিলের বিরুদ্ধে।

গ্রুপ–৪

	পেরু	হল্যাণ্ড	স্কটল্যাণ্ড	ইরান
পেরু		০—০	৩—১	৪—১
হল্যাণ্ড	০—০		২—৩	৩—০
স্কটল্যাণ্ড	১—৩	৩—২		১—১
ইরান	১—৪	০—৩	১—১	

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
৩	২	১	০	৭	২	৫
৩	১	১	১	৫	৩	৩
৩	১	১	১	৫	৬	৩
৩	০	১	২	২	৮	১

যাঁরা গোল করেছেন। পেরুর পক্ষে : কুয়েটো ও কুবিলাস-২ স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে; ভেলাসকোয়েজ ও কুবিলাস-৩ (হ্যাটট্রিক-দুটি পেনাল্টি থেকে) ইরানের বিরুদ্ধে। **হল্যাণ্ডের পক্ষে :** রেনসেনব্রিঙ্ক-৩ (হ্যাটট্রিক, দুটি গোল পেনাল্টি থেকে) ইরানের বিরুদ্ধে; রেনসেনব্রিঙ্ক (পেনাল্টি) ও জনি রিও স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। **স্কটল্যাণ্ডের পক্ষে :** জর্ডন পেরুর বিরুদ্ধে; ইরানের আবদুলাহির নিজ গোল; ডালগলিস ও গেমিল-২ (একটি পেনাল্টি) হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। **ইরানের পক্ষে :** দালানফর স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে; হাসান রেসান পেরুর বিরুদ্ধে।

গ্রুপ-এ

	ইতালি	পঃ জার্মানি	হল্যাণ্ড	অস্ট্রিয়া	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
হল্যাণ্ড	২—১	২—২		৫—১	৩	২	১	০	৯	৪	৫
ইতালি		০—০	১—২	১—০	৩	১	১	১	২	২	৩
পঃ জার্মানি	০—০		২—২	২—৩	৩	০	২	১	৪	৫	২
অস্ট্রিয়া	০—১	৩—২	১—৫		৩	১	০	২	৪	৮	২

যাঁরা গোল করেছেন—হল্যাণ্ডের পক্ষে : আর্নি ব্রাণ্ড, রেনসেনব্রিঙ্ক—পেনাল্টি, জনি রেপ—২, উইলি কারকফ (অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে), আইরিহান, রেনে কারকফ (পঃ জার্মানির বিরুদ্ধে), আইরিহান, আর্নি ব্রাণ্ড (ইতালির বিরুদ্ধে)। **ইতালির পক্ষে :** রসি (অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে), আর্নিব্রাণ্ড, নিজগোল (হল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায়)। **পঃ জার্মানির.. পক্ষে :** রুডি আবরামকজিক, ডিটার মুলার (হল্যাণ্ডের বিপক্ষে), কর্ল হাইনৎস রুমেনিগ, হোয়েলজেনবীন (পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে)। **অস্ট্রিয়ার পক্ষে :** এনরিখ ওবেরমেয়ার (হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে), হান্স ক্রাংকল ২, বার্টি ভকস, নিজগোল (পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে)।

গ্রুপ-বি

	ব্রাজিল	আর্জেন্টিনা	পোল্যাণ্ড	পেরু	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
আর্জেন্টিনা	০—০		২—০	৬—০	৩	২	১	০	৮	০	৫
ব্রাজিল		০—০	৩—১	৩—০	৩	২	১	০	৬	১	৫
পোল্যাণ্ড	১—৩	০—২		১—০	৩	১	০	২	২	৫	২
পেরু	০—৩	০—৬	০—১		৩	০	০	৩	০	১০	০

যাঁরা গোল করেছেন—আর্জেন্টিনার পক্ষে : মারিও কেম্পেস—২ (পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে) অলবার্টো টারানটিনি, লিওপোল্ডো লুক—২, রেনে হাউসম্যান (পেরুর বিরুদ্ধে)। **ব্রাজিলের পক্ষে :** ডিরকু—২, জিকো—পেনাল্টি (পেরুর বিরুদ্ধে), নেলিনহো, রবার্টো—২ (পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে)। **পোল্যাণ্ডের পক্ষে :** আঁদ্রেস জারম্যাক (পেরুর বিরুদ্ধে), লাটো (ব্রাজিলের বিরুদ্ধে)।

এই লেখার সঙ্গে ৩৮টি খেলার ফল, ৩৮টি খেলায় যাঁরা ১০২টি গোল করেছেন—তাঁদের নাম, বেশি গোলের হিসাব—সবই দেওয়া হচ্ছে। ফাইনাল খেলাটির ধারাবিবরণী সবাই হয়ত শুনেছ। টেলিভিশনেও হয়ত দেখেছ ৯০ মিনিটের পরও অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের খেলায় দুই দল মরণপণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে কী কঠিন সংগ্রাম করেছে!

চার বছর আগের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির কাছে হল্যাণ্ডের যে দলটি ১—২ গোলে হেরে গিয়েছিল সেই দলের ৮ জন খেলোয়াড় ছিলেন এবারকার দলে। সুতরাং হল্যাণ্ড দলে অভিজ্ঞ এবং কৃতী ট্যালেণ্টেড খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল বেশি। অপর দিকে চার বছর আগে আর্জেন্টিনার যে দলটি দ্বিতীয় পর্যায়ে হল্যাণ্ডের কাছে হেরে গিয়েছিল ০—৪ গোলে, সেই দলের মাত্র দুজন খেলোয়াড় ছিলেন এবারের দলে। বেশির ভাগ তরুণ খেলোয়াড় নিয়েই মিনোত্তি আর্জেন্টিনাকে আক্রমণে ও রক্ষণে সমান দক্ষ চমৎকার একটি দলে পরিণত করেন। তাই হল্যাণ্ডের তীব্র আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে আর্জেন্টিনা পালটা আক্রমণ হেনেছে। পুরো দু ঘণ্টার মরণপণ লড়াইয়ে ৩—১ গোলে জিতে ফুটবলে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠের সম্মান পেয়েছে।

কোচ মিনোত্তি বলেছেন, "দল হয়ে খেললে বিশ্বকাপ জেতা যায়।" তার মানে কী? দল হয়ে তো সব দলই খেলে। আসলে মিনোত্তি এক মন, এক প্রাণ, একতার কথা বলেছেন।

দলবদ্ধ হয়ে খেলে বিশ্বকাপ জয়ের মূলে দলের প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তবু ১৯৭৮-এর বিশ্বকাপ ফাইনাল একজন খেলোয়াড়কে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাঁর নাম মারিও কেম্পেস। তিনি আর্জেন্টিনার প্রথম দুটি গোল করেন।

কেম্পেসই এবার সবচেয়ে বেশি গোল দেন। প্রতিযোগিতার শততম গোলটিও তিনি করেছেন। কেম্পেস ছয়টি গোল করেছেন শেষ চারটি খেলায়। তারপর পাঁচটি করে গোল করেছেন হল্যাণ্ডের রবি রেনসেনব্রিঙ্ক এবং পেরুর টিওফিলো কুবিলাস। তবে রেনসেনব্রিঙ্কের চারটি এবং কুবিলাসের দুটি গোল পেনাল্টি কিক থেকে। দুজনই ইরানের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেন পেনাল্টি কিক থেকে দুটি করে গোল পেয়ে। এঁরা বাদে আর কেউ এবার হ্যাটট্রিক করতে পারেন নি।

আমাদের এখানে নামী খেলোয়াড়রা পেনাল্টি কিক থেকে গোল করতে না পারলে কিংবা আত্মঘাতী গোল করলে তোমরাই তো দুয়ো দাও। বিশ্বকাপের খেলাতে কিন্তু দুটো ব্যাপারই দেখা যায়। এবার আত্মঘাতী গোল হয়েছে তিনটি। স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায় ইরানের আব্দুলিলাহি, ইতালির সঙ্গে খেলায় হল্যাণ্ডের আর্নি ব্রাণ্ড এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে খেলায় পশ্চিম জার্মানির অধিনায়ক বার্টি ভগটস নিজের গোলে বল ঢুকিয়েছেন প্রবল চাপের মুখে।

পেনাল্টি কিক থেকে গোল করতে পারেননি স্কটল্যাণ্ডের ডন ম্যাসন পেরুর বিরুদ্ধে এবং পোল্যাণ্ডের অধিনায়ক কামিমিয়েরেজ দেনা আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনা তখন ১—০ গোলে এগিয়ে ছিল। দেনা গোল করতে পারলে খেলার ফল কী হত বলা শক্ত। ওই একটি গোলে আর্জেন্টিনার ফাইনালে ওঠাও আটকে যেতে পারত। উল্লেখ্য ছিল, দেনার এটি শততম আন্তর্জাতিক খেলা। সেই খেলাতেই পেনাল্টি মিস করলেন।

এবার চারটি ব্যাপারে রেকর্ড হয়েছে। এক—পশ্চিম জার্মানির গোলকীপার সেপ মেয়ার চারটি খেলায় কোনো গোল না খেয়ে পঞ্চম খেলায় গোল খেয়েছেন এবং পরাজিত হয়েছেন বিশ্বকাপের

খেলায় ৪৭৫ মিনিট অপরাজিত থাকার পরে। উনিশশো ছেষট্টির বিশ্বকাপে ৪৪৮ মিনিট অপরাজিত থাকার রেকর্ড ছিল ইংল্যাণ্ডের গোলকীপার গর্ডন ব্যাঙ্কসের। দুই—এবারের প্রথম এবং বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম গোলটি করেছেন ফ্রান্সের লাকোঁবে, ইতালির বিরুদ্ধে তিনি গোলটি করেন খেলা শুরু হওয়ার ৩০ সেকেণ্ডের মাথায়। তিন—সুইডেনের নর্ডকুইস্ট এবারের তিনটি ম্যাচ নিয়ে মোট ১১১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ইংল্যাণ্ডের ববি মুরের ১০৮টি খেলার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। চার—ফাইনাল খেলার একটি টিকিট কালোবাজারে বিক্রি হয়েছে আমাদের টাকার অঙ্কে সাড়ে আট হাজার টাকায়। গতবার দর উঠেছিল পাঁচ হাজার টাকার মতো।

এবার সবচেয়ে বেশি বয়সের খেলোয়াড় কে ছিলেন? হল্যাণ্ডের গোলকীপার ইয়ান ইয়ংব্লয়েড। ও'র বয়স ৩৭। ১৫ বছরের ছেলে আছে। তার সঙ্গেও খেলেন। খেলবেন আরও দুই বছর। সবচেয়ে কম বয়স ছিল পোল্যাণ্ডের আঁদ্রেই আইওয়ানের। মাত্র ১৮।

পৃথিবীর ৩২টি দেশের যে ৩২ জন রেফারী এবার বিশ্বকাপের খেলাগুলি পরিচালনা করেছেন, ফিফার রেফারীজ কমিটি আগে থেকেই তাঁদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, খেলার সময় তাঁরা যেন কোনোরকম অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ এবং ফাউল বরদাস্ত না করেন। রেফারীরা করেনওনি। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে তাঁরা সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হয় তিনজন খেলোয়াড়কে।

বিশ্বকাপের খেলায় হার-জিত নিয়ে কত পাগলামির কথাই তো তোমরা শুনেছ। এবারও কিন্তু পাগলামির মাত্রা কম ছিল না। ব্রাজিল প্রথম দিকে মোটেই ভাল খেলতে পারেনি, যার জন্য পেলে পর্যন্ত বলেছিলেন, "ব্রাজিল আমাদের ফুটবল উপহার দেয়নি, দিয়েছে চোখের জলের উপাদান।" সেই ব্রাজিল দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম খেলায় ৩—০ গোলে পেরুকে হারাতেই রাজধানী রিও ডি জেনিরোয় কী উল্লাস! খেলা শেষ হওয়ার আগেই, একটি বা দুটি গোলের খবর শুনেই মারা গেলেন চারজন। একজন গাড়ি চালাতে চালাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায়। একজন আহ্লাদে আটখানা হয়ে চলন্ত রেলের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে। আর দুজন বৃদ্ধ আনন্দের আতিশয্যে হার্ট ফেল করে। ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিতলে কী হত ভাবতে পারো?

আর্জেন্টিনাও কম যায়নি। বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের জোয়ারে, বিজয় উৎসব পালনে সারা দেশটাই তো পাগল হয়ে ওঠে। পৃথিবীর কোনো বিজয় উৎসবে নাকি এমন বৈচিত্র্যময় দৃশ্য দেখা যায় নি, যেমন দেখা গিয়েছিল বুয়েনস এয়ারেসে পঁচিশে জুনের রাত্রে। আর্জেন্টিনার জনসংখ্যা আড়াই কোটি। মনে হয়েছিল, জনসংখ্যা যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সারা দেশের মানুষ রাজপথে নেমে এসেছিল বিজয় মিছিলে যোগ দিতে। বুয়েনস এয়ারেস দাবি করে, তাদের প্রধান রাজপথ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত। রাজপথের নাম—"৯ ডিই জুলিও অ্যাভিনিউ"। ফুটবল মাঠের দৈর্ঘ্য ১০০ গজ থেকে ১৩০ গজ। রাজপথটি এত চওড়া যে, ওর মধ্যে লম্বালম্বি দুটি করে ফুটবল মাঠ পড়তে পারে। ফাইনাল খেলার পরে ওই রাজপথ পরিণত হয়েছিল জনসমুদ্রে। নাচ-গান, বাজি-বাজনা তো ছিলই। আর ছিল খেলোয়াড়দের জার্সির নীল-সাদা রংয়ের সঙ্গে মেলানো পতাকা। গ্যাস বেলুন ও রঙিন কাগজে ছেয়ে গিয়েছিল সারা শহর। ছেলেদের মাথায় ছিল নীল-সাদা টুপি, মেয়েদের মাথার চুলে নীল-সাদা ফিতে।

অন্যদিকে, হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টার্ডামে তখন শোকের ছায়া। পুলিশ-প্রহরা থাকা সত্ত্বেও আর্জেন্টিনার দূতাবাসে হামলা চালায় ক্ষুব্ধ জনতা।

রাজপ্রাসাদে বসে টেলিভিশনে খেলা দেখছিলেন রানী জুলিয়ানা ও রাজকুমার বার্নহার্ড। হল্যাণ্ড পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও খেলার শেষে তাঁরা অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন বুয়েনস এয়ারেসে, খেলোয়াড়দের কাছে। সরকারও অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "হল্যাণ্ড তোমাদের জন্য গর্বিত।" একেই বলে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব। খেলায় হারজিত তো আছেই। সংগ্রাম করে হারাও মস্ত গৌরবের ব্যাপার।

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানের খেলা

ব্রাজিল—২	:	ইতালি—১
(৬৩ মিঃ নেলিনহো, ৮০ মিঃ ডিরকু)		(৩৮ মিঃ কাসিও)

ফাইনাল

আর্জেন্টিনা—৩		হল্যাণ্ড—১
(৩৭ মিঃ ও ১০৪ মিঃ কেম্পেস, ১১৪ মিঃ বার্তোনি)		(৮১ মিঃ নানিঙ্গা)

আর্জেন্টিনা দলে ছিলেন : উবাল্ডো ফিলোল, ডেনিয়েল পাসারেলা (অধিনায়ক), জোরগে ওলগুইন, লুইস গ্যালভান, অ্যালবার্টো টারানটিনি, অসওয়াল্ডো আর্তিলিস (মার লা রোসা), আমেরিকো গ্যালেগো, মেরিও কেম্পেস, ডেনিয়েল বার্তোনি, লিওপোল্ডো লুকে ও অসকার ওরটিজ (রেনে হাউসম্যান)।

হল্যাণ্ড দলে খেলেন—ইয়ান ইয়ংব্লয়েড, রুডি ক্রল (অধিনায়ক), উইম জ্যানসেন (উইম সুরবিয়ার), আর্নি ব্রাণ্ড, ইয়ান পুরভিয়েট, অ্যারি হ্যান, যোহান নীসকেনস, উইলি ভ্যানডার কারকফ, রেনে ভ্যানডার কারকফ, জনি রেপ (নানিঙ্গা) ও রব রেনসেনব্রিঙ্ক।

রেফারী—সার্জিও গনেলা (ইতালি)

আবার ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট

অশোক দাশগুপ্ত

উনিশশো একষট্টির চোঠা ডিসেম্বর। একটা মরা ম্যাচ হঠাৎ বেঁচে উঠল। ইডেনে ভারত-পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্টের মাঝ-পথেই বোঝা গিয়েছিল, এই খেলাটিও গড়াচ্ছে অনিবার্য ড্র-এর দিকে। পাকিস্তানের ভদ্রস্থ ৩০১ রানের জবাবে ভারত করল শোচনীয় ১৮০। ফজল মামুদ পেলেন ছাব্বিশ রানে পাঁচ উইকেট।

জয়ের গন্ধ শুঁকছেন অধিনায়ক ফজল মামুদ—কিন্তু বৃষ্টি এল ঝেঁপে। বৃষ্টি থামল একসময়। কিন্তু এ তো আর ফুটবল নয় যে, বল গড়ালেই খেলা চলবে। কলকাতার দুই আম্পায়ার সন্তোষ গাঙ্গুলি আর শম্ভু পানের বিচারে খেলা বন্ধ থাকল তৃতীয় দিন লাঞ্চের আধ ঘণ্টা পর থেকে চতুর্থ দিন চায়ের কিছু আগে পর্যন্ত। ফজল মামুদ চটলেন। আমরা কিছু স্বস্তি পেলাম।

চতুর্থ দিন চা খেতে-খেতে সবাই ভাবলেন, খেলা তো ড্র, এখন বেগ-এর একটা ইনিংস যদি কাল দেখা যায়। আব্বাস আলি বেগ প্রথম ইনিংসে খেলেছিলেন কয়েক মিনিট, করেছিলেন মাত্র উনিশ, আউট হয়েছিলেন দিনের শেষ বলে। কিন্তু অমন একটি উনিশের জন্য অনেক সেঞ্চুরিকে অবহেলা করা যায়। ফুটফুটে আব্বাস মাত্র তিনটি শটেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সুন্দর ক্রিকেট কাকে বলে।

শেষ দিন খেলা শুরু হল ঝড়ের বেগে। ঝড়ে উড়ে গেলেন দেশাই আর সুরেন্দ্রনাথ, হাওয়ায় নাচল পতাকার মতো দুটি চনমনে ব্যাট। হানিফ আর জাভেদ বার্কি মরা খেলার গোড়ায় জল ছেটালেন।

একশো আশি মিনিটে দুশো সাতষট্টি করলে জিত—এই অবস্থায় ব্যাট করতে এল ভারত। জেতার কোনো প্রশ্ন নেই, তবু টুকটুক করে রান উঠল সাতচল্লিশ। আমার মতো বাচ্চারা তো বটেই, বড়রাও বলতে লাগলেন, "একজন আউট হও না বাবা, বেগের খেলা একটু দেখি!"

প্রার্থনায় দারুণ কাজ হল। সাতচল্লিশেই প্যাভিলিয়নে ফিরলেন জয়সীমা আর অধিনায়ক কন্ট্রাক্টর, দুই ওপেনার। বেগ এলেন এবং গেলেন। মাঝে একবার ব্যাটের টানে পিচের ধুলো উড়ল। এবং একটি রান।

তিন উইকেটে আটচল্লিশ। উমরিগরও এলেন এবং ফিরলেন। যাবার আগে একটি স্কোয়ার কাট এবং চার রান। চার উইকেটে পঁয়ষট্টি।

সেই মুহূর্তে ইডেনে একটি মরা খেলা জেগে উঠল। ভারত হেরে যেতে পারে, তবু আমরা সেই রোমাঞ্চের ছোঁয়া পেলাম, যা ক্রিকেটকে ক্রিকেট করেছে।

আর ফজল মামুদকে যদি তখন দেখতে। প্রথম ইনিংসে পেয়েছেন পাঁচ উইকেট। সাত বছর আগে ওভালে কচুকাটা করে (দুই ইনিংসে নিরানব্বুই রানে বারো উইকেট) হারিয়েছেন ইংল্যান্ডকে। ফজলের হাবভাবে মনে হল, বয়স হলেও বাঘ হচ্ছে বাঘ। সামান্য ছুটে বল করতে লাগলেন, যাতে বেশি ওভার বল করা যায়। পাকিস্তানের ফিল্ডিং যেন ভারতের গলা চেপে ধরতে চাইল। নাসিমুল গনি, মুস্তাক, বার্কি আর ওয়ালিস ম্যাথিয়াস যেন গোটা মাঠ ছেয়ে ফেললেন,—কোথাও ফাঁক নেই।

কিন্তু ক্রীজে তখন এমন দুজন ভারতীয়, যাঁরা খেলেন সোজা ব্যাটে এবং পিচের মধ্যে দাঁড়িয়ে শলা-পরামর্শ করেন ঘন-ঘন। মঞ্জরেকর আর বোরদে একটি করে বল মিশিয়ে দেন মাটিতে, আর হাত-পা ছোঁড়েন ফজল। তাড়াতাড়ি ঘুরে পরের বল দিতে এসেই দেখেন, বোরদে একমনে ব্যাট দিয়ে পিচ সারাচ্ছেন। অথবা মঞ্জরেকর বোরদের পিঠে হাত রেখে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন।

খেলাটা আবার যথারীতি মরে গেল। চার উইকেটে একশো সাতাশ করে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন বোরদে আর মঞ্জরেকর। সব ভুলে যাব, ফজলের ঐ ছটপটানি কখনো ভুলব না।

১৯৬১ সালে কলকাতার ঐ তৃতীয় টেস্টের মতো সব টেস্টই ড্র হয়েছিল। কেউ হারতে রাজি নয়, তাই কেউ জেতেওনি। উইজডেন লিখছে : "জাতীয় সম্মান রক্ষাই ছিল আসল ব্যাপার। ক্রিকেট ছিল গৌণ। প্রতি একশো বলে মাত্র উনচল্লিশ রান তুলেছে ভারত। পাকিস্তান আরো কম : পঁয়ত্রিশ!"

ভারত-পাকিস্তান প্রথম টেস্ট সিরিজ হয় ১৯৫২-৫৩ মরসুমে। প্রথম তিনটি খেলার মীমাংসা হয়। ভারত ২—১

পলি উমরিগড়

ফজল মামুদ

হানিফ মহম্মদ

চাঁদু বোরদে

ম্যাচে এগিয়ে রাবার পায়। কিন্তু সেই যে তারপর ড্র শুরু হল, তা আর থামেনি। সেবার বাকি দুটি টেস্টও ড্র হল। অধিনায়ক ছিলেন ওদিকে কারদার আর এদিকে অমরনাথ।

১৯৫৪-৫৫ মরসুমে ভারত গেল পাকিস্তানে। ফজল তখন সদ্য লেগ কাটারে ইংল্যান্ড কাঁপিয়ে ফিরেছেন। তিনিই অধিনায়ক। ভারতের দলপতি ভিনু মানকড়। পরপর পাঁচটি টেস্ট ড্র হল। আর ১৯৬১ সালের কথা তো আগেই বলেছি। পরপর বারোটি টেস্টে কোনো মীমাংসা হল না। আর তারপর তো দুই দেশে খেলাই বন্ধ হয়ে গেল।

সতেরো বছর বাদে আবার বাধছে লড়াই—ক্রিকেট মাঠে। ভারত যাচ্ছে পাকিস্তানে। এর আগের পনেরোটি টেস্টে যারা সেঞ্চুরি করেছেন, অথবা পেয়েছেন অনেক অনেক উইকেট—তাঁরা সকলেই খেলা ছেড়েছেন। তবু গাভাসকার আর হারুন রশিদ যা করতে পারেন, এর আগে কারা তা করেছেন তা ঝালিয়ে নিতে ক্রিকেট-উৎসাহীদের আগ্রহ নিশ্চয় থাকবে।

ভারতের পক্ষে সেঞ্চুরি আছে মোট আটটি। এর মধ্যে একা উমরিগড় করেছেন পাঁচটি। প্রথম সিরিজে একটি, দ্বিতীয় সিরিজে আর একটি এবং শেষ সিরিজে তিনটি। ১৯৫২-৫৩ সালের সিরিজে একটি করে শতরান পেয়েছিলেন বিজয় হাজারে এবং দীপক শোধন। দীপক শোধনের সেই প্রথম এবং সেই শেষ টেস্ট সেঞ্চুরি। বাকি সেঞ্চুরিটি চাঁদু বোরদের।

ভারতের আটের জবাবে পাকিস্তানের পক্ষেও আছে আটটি শতরান। হানিফ মহম্মদ এবং সঈদ আমেদ করেছেন দুটি করে সেঞ্চুরি। সঈদ খেলেছেন শুধুমাত্র ১৯৬০—৬১ সিরিজে। হানিফ শতরান পেয়েছেন বোম্বাই (১৯৬০—৬১) এবং ভাওয়ালপুরে (১৯৫৪—৫৫)। প্রথম সিরিজে সেঞ্চুরি করেন নজর মহম্মদ। ১৯৫৪-৫৫ মরসুমে এই কৃতিত্ব দেখান আলিমুদ্দিন। ভারত সফরে সেঞ্চুরির তালিকায় নাম লেখান ইমতিয়াজ আমেদ এবং মুস্তাক মহম্মদ।

ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বেশি মোট রান উঠেছে শেষ সিরিজের মাদ্রাজ টেস্টে : নয় উইকেটে পাঁচশো উনচল্লিশ। ঐ সিরিজেই মাদ্রাজ টেস্টে আট উইকেটে চারশো আটচল্লিশ পাকিস্তানের সেরা ইনিংস।

এবার কমের হিসেবটাও নাও। পাকিস্তান ১৯৫২—'৫৩-র দিল্লি টেস্টে তুলেছিল মোটে একশো পঞ্চাশ। কিন্তু ঐ সিরিজেই লখনউ টেস্টে ভারত করেছিল মাত্র একশো ছয়।

সতেরো বছর বাদে আবার শুরু হচ্ছে লড়াই। নিশ্চয় অনেক রেকর্ড ধুলোয় গড়াবে।

এসো, একটা স্বপ্নের টীম তৈরি করে লেখা শেষ করি। অনেকেই বলেন ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশ একটা ক্রিকেট টীম করলে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। প্যাকার সাহেবের কথা ভুলে যাও। আমাদের টীম কেমন হতে পারে ? ইনিংস শুরু করবেন গাভাসকর আর মজিদ খান।

তিন নম্বরে যদি জাহির আব্বাস আসেন, চার নম্বরে নামবেন গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ। এরপর ভারতের ক্রিকেটার কিছুক্ষণ খুঁজো না। একে একে আসবেন হারুন রশিদ, জাভেদ মিয়াঁদাদ মুস্তাক মহম্মদ, ইমরান খান এবং উইকেটকীপার ওয়াসিম বারি। অবশ্য কিরমানিকেও নেওয়া যায়। পেস বোলার হিসেবে ইমরান ছাড়াও থাকবে সরফরাজ নওয়াজ। তোমরা এবার ভাবছ : বাকি দুটি জায়গায় ভারতের দুজনকে কে বাদ দেয় ? না, কেউ বাদ দেবে না। বেদী তো থাকবেনই। সঙ্গে চন্দ্রশেখর বা প্রসন্ন—একজন আসবেন।

ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

খেলার মাঠে গোলমাল

পুষ্পেন সরকার

কলকাতার ফুটবল মরসুম এখন জমজমাট। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে নেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ময়দানের চেহারা পালটে গেছে। কাতারে-কাতারে মানুষ যাচ্ছে খেলা দেখতে। আবার খেলা শেষে ফিরছে সব হৈচৈ করে। ট্রামে বাসে ক্লাব-পতাকা। মানুষ সব বাদুড়ঝোলা।

ফুটবল মরসুম শুরু হলেই সদস্য, সমর্থকদের দুশ্চিন্তা। দলের খেলোয়াড়দের আলোচনা, সমালোচনা। স্কুলে, কলেজে দোকানে, বাজারে, রাস্তাঘাটে—সর্বত্র ফুটবল। পড়তে বসে মন চলে যায় ময়দানে। সুরজিৎ, বিদেশ, প্রসুন চিন্ময়রা পড়ার বই থেকে মন টেনে নিয়ে যায়।

লীগ খেলা জমে উঠেছে। কিন্তু লীগ খেলার সূচনা তেমন শুভ হয়নি। এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যাতে ফুটবল অনুরাগীদের দুশ্চিন্তা বেড়ে গিয়েছে। অনেকেরই প্রশ্ন, ফুটবল মরসুম নির্বিঘ্নে শেষ হবে তো ?

মহমেডানের প্রথম খেলা ছিল সালকিয়া ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে। খেলা শেষ হয়নি। নির্ধারিত সময়ের আগেই খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে। মূল কারণ, রেফারীর একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে দর্শকদের বিক্ষোভ। দু দলের খেলোয়াড়রা রেফারীর সিদ্ধান্ত নিয়ে কিন্তু কোনো হৈচৈ করেননি। আবার, ইস্টবেঙ্গল আর উয়াড়ির খেলার দিনেও মাঠে ঘটল অপ্রীতিকর ঘটনা।

মাঠে খেলোয়াড়রা খেলেন। দর্শক এবং সমর্থকরা খেলোয়াড়দের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে খেলাকে উপভোগ্য করে তোলেন। দর্শকদের অভিনন্দনে একজন খেলোয়াড়ের খেলা আরও ভাল হয়ে ওঠে। আবার ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে যে কোন খেলোয়াড়ের খেলা অনেক সময়ে আরও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। খেলার ভাল-মন্দ বেশ কিছুটা নির্ভর করে দর্শকদের ওপর। খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে খেলা দেখলে একদিকে যেমন খেলার আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়, অন্যদিকে তেমন খেলাটাও জমে ওঠে।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান দুটো দলই খুব শক্তিশালী। দুই দলেই অনেক নামী খেলোয়াড়। এই দুটি দলের বিরুদ্ধে যে-কোনো তরুণ দলেরই হারার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। তবুও এই ধরনের খেলায় প্রত্যেক খেলোয়াড় মন-প্রাণ দিয়ে খেলেন। নিজের এবং দলের সুনামকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেন প্রত্যেকে। দর্শকরা যদি ঐ তরুণ ও অনামী খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন তাহলে খেলাটা আরও জমে যেতে পারে। দলের জয়ে বা সাফল্যে আনন্দ পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেই জয় যদি খুব সহজে আসে তাহলে আনন্দের মাত্রা তেমন বাড়ে না। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে জয়ের আনন্দ অনেক বেশি।

কিন্তু, দুঃখের কথা, কলকাতার মাঠে বড় দলগুলির অধিকাংশ

ফোটো তপন দাস

মহমেডানের সাজ্জাদ বাটার গোলে বল ঢোকাচ্ছেন

ফোটো তপন দাস

রঞ্জিত মুখার্জির (ইস্টবেঙ্গল) শট পুলিস-গোলরক্ষক আটকেছেন

ফোটো তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যাম থাপার (মোহনবাগান) শট আটকেছেন ভ্রাতৃসংঘের গোলরক্ষক

ফোটো অলক মিত্র

মাঠে খেলা বন্ধ, গ্যালারিতে পুলিস

সমর্থকের কাছে দলের জয়ই একমাত্র কাম্য। তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া দলগুলি দর্শকদের কাছ থেকে তেমন উৎসাহ বা অভিনন্দন পায় না। তার ফলে খেলা হয়ে পড়ে একতরফা।

অথচ একটা কথা এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে, বড় দলের নামী খেলোয়াড়রা একদিনে বড় হননি। তাঁরাও এসেছেন ঐসব ছোট দল থেকে। প্রতিভা তাঁদের ছিল। উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং শিক্ষায় ও অনুশীলনে আজ তাঁদের স্থান হয়েছে বড় দলে। নাম হয়েছে সারা দেশে। সুতরাং সমর্থকরা যদি একচোখো মনোভাব নিয়ে দেখেন, তাহলে বহু খেলোয়াড়ের ভবিষ্যতে বড় হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হবে।

দর্শকদের চাপে শুধু খেলোয়াড় নয়, রেফারীদেরও স্বাধীনভাবে খেলা পরিচালনার পথে বাধা সৃষ্টি হয়। সমর্থকদের ভয়ে অনেক সময় রেফারীরা সিদ্ধান্ত নিতে বিচলিত হন। ফলে অনেক সময় দুর্বল বা ছোট দলগুলি সঠিক সুবিচার পায় না।

উগ্র সমর্থকরা যে কেবল মাত্র বিপক্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, তাই নয়, দলের প্রিয় খেলোয়াড়রাও খারাপ খেললে তাঁদের হাতে লাঞ্ছিত হন। খুব বড় খেলোয়াড়ের পক্ষেও যে সবসময় ভাল খেলা সম্ভব নয়, এটা তাঁরা বুঝতে চান না।

ইস্টবেঙ্গল ও হাওড়া ইউনিয়ন এবং মোহনবাগান ও কুমারটুলির দুটি খেলায় হাওড়া ইউনিয়ন এবং কুমারটুলির খেলোয়াড়রা মাঠে ঢুকতে না পারায় খেলা দুটি হয়নি। খেলোয়াড়রা যদি সুস্থভাবে মাঠে ঢুকতে না পারেন তাহলে কোনো দলের পক্ষেই খেলা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারেও দর্শক ও সমর্থকদের একটা বড় দায়িত্ব আছে।

দর্শক হামলায় খেলা পরিত্যক্ত হবার ঘটনা যে এবারেই প্রথম হয়েছে এমন নয়। প্রতি বছরই এ ধরনের দু চারটে ঘটনা ঘটে থাকে। অনেক আলোচনা ও সমালোচনা হলেও অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি।

ইস্টবেঙ্গল পরপর ৬ বার লীগ জিতে নতুন রেকর্ড করল। অথবা মোহনবাগান 'ত্রিমুকুট' পেল। এ সম্মান ঘরোয়া। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এর কোনও দামই নেই। ভারতের ফুটবল খেলার মান যাচাই হবে কিন্তু ঐ আন্তর্জাতিক ফুটবলে সাফল্য বা ব্যর্থতা দিয়ে।

১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারত সেমিফাইনালে উঠেছিল। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারত ফ্রান্সের সঙ্গে ১—১ ড্র করে এবং হাঙ্গারির সঙ্গে অসাধারণ খেলে ১—২ গোলে পরাজিত হয়। হাঙ্গারি এবং ফ্রান্স এবারের বিশ্বকাপে ফাইনাল পর্যায়ে খেলেছে। ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সে-সময়ে সারা বিশ্বে ভারতীয় ফুটবলের সুনাম বেড়েছিল। সেই ভারতের আজ এশিয়ান গেমস ফুটবলে অনেক নীচে স্থান। অলিম্পিকের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা থেকে ফিরে আসছে বার বার।

সুতরাং কলকাতার লীগ বা শীল্ড আন্তর্জাতিক আসরে ভারতকে কোনো সম্মান এনে দেবে না—এই কথাটা মনে রেখে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির কথাই বেশি করে ভাবতে হবে। ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির পথে বাংলার অবদান সবচেয়ে বেশি। বাংলা এখনও ফুটবলে ভারতশ্রেষ্ঠ। তাই ভারতীয় ফুটবলের মান উঁচু করতে হলে বাংলাকেই আবার অগ্রণীর ভূমিকা নিতে হবে। কলকাতা তথা বাংলার ফুটবলপ্রেমী জনসাধারণের সহযোগিতা না পেলে ভারতের ফুটবলের মান উন্নত হওয়া অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব।

বড় হয়ে ওঠার খুসীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর। আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না ?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিত করতে আমাদের যে-কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

ছোটরা সবাই এসো আমাদের রিচি রোড ও গড়িয়া শাখায় তোমাদের

চিলড্রেন্‌স কাউণ্টার-এ

- নিজের নামে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলো, পাশবই নাও।
- নিজের নামে টাকা জমা দাও, নিজের সইতে টাকা তোলো।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১
হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১
চেয়ারম্যান : জে এন বিশ্বাস

Progressive/UIB-/78

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

মণিমেলা মহাকেন্দ্র আয়োজিত ছোটদের বাংলা ও ইংরেজি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আগামী ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। নাম দেবার শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট. প্রতিটি বিষয়ে চারটি করে বিভাগ আছে। বিস্তারিত খবর ও আবেদন-পত্রের জন্য রবি ও বৃহস্পতিবার ছাড়া সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত যে কোনো দিন মণিমেলা মহাকেন্দ্রে (রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক-২, রুম-৫, কলকাতা-৭০০০২৯ ফোন : ৪৬-৯৮১০) যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সম্প্রতি বিভিন্ন অঞ্চলে মণিমেলার স্বেচ্ছাসেবী শিশু-কল্যাণ কর্মীদের জন্য প্রাক্‌-নায়ক শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উত্তীর্ণ কর্মীরা আগামী বার্ষিক শিবিরে প্রাথমিক সার্টি-ফিকেট পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অধিকারী বলে বিবেচিত হবে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে বিভিন্ন এলাকায় মণি-ভাইবোনদের জন্য কুচকাওয়াজ ও খো-খো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে সব মণিমেলা এই ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিতব্য আঞ্চলিক কুচকাওয়াজ ও খো-খো প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

আগামী ৬ আগস্ট থেকে বিভিন্ন এলাকায় আন্তঃ মণি-মেলা বাংলা কুইজ (ধাঁধা) প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায় শুরু হচ্ছে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা আগামী ২০ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে।

মণি সন্দেশ

হাওড়ার মিলন বীথি মণিমেলা ও বিরাটির পল্লী মণিমেলা স্থানীয় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক অবৈতনিক কোচিং ক্লাসের আয়োজন করেছে। ২৪ পরগনার গড়িফা মণি-মেলা এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এই মণিমেলা একটি সুন্দর হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেছে। দুর্গানগরের নারায়ণ পল্লী মণিমেলার বোনেরা ২৪ পরগনার উইমেনস স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত খো-খো প্রতি-যোগিতায় রানার্স আপ-এর সম্মান অর্জন করেছে। এই মণি-মেলার দুজন মণিভাই জেলা খো-খো দলে নির্বাচিত হয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুরের বিনয়-বাদল-দীনেশ মণিমেলার ভাইবোনেরা সম্প্রতি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেষণ করে। আসানসোলের রেলপার মণিমেলার ৩১তম বার্ষিক উৎসব ও বেহালার সোনালি মণিমেলার চতুর্থ বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি পালিত হয়। হাওড়ার পল্লীমঙ্গল মণিমেলার চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সাংস্কৃতিক ও শারীরিক কার্যক্রম পরিবেষিত হয়।

২৪ পরগনার গড়িফা মণিমেলা, দুর্গাপুরের নারায়ণ পল্লী মণিমেলা, গড়িয়ার কুঁড়ি কমল মণিমেলা, ২৪ পরগনার নৈহাটি মণিমেলা, যাদবপুরের রাজাপুর মিলনী মণিমেলা সম্প্রতি সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করে।

নোলেদা / অহিভূষণ মালিক

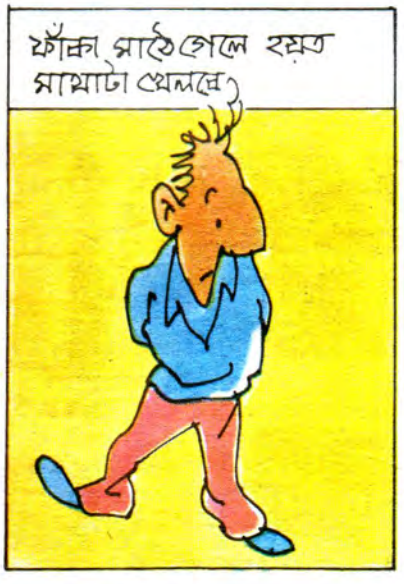

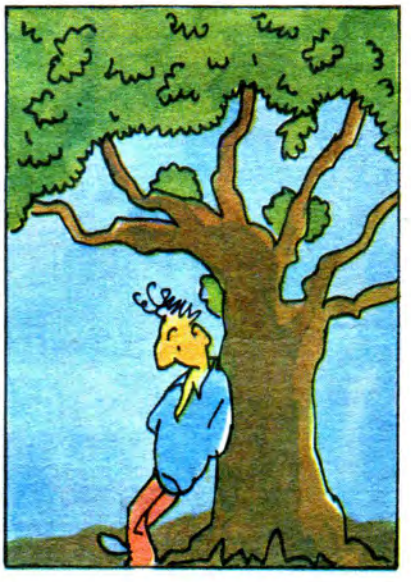

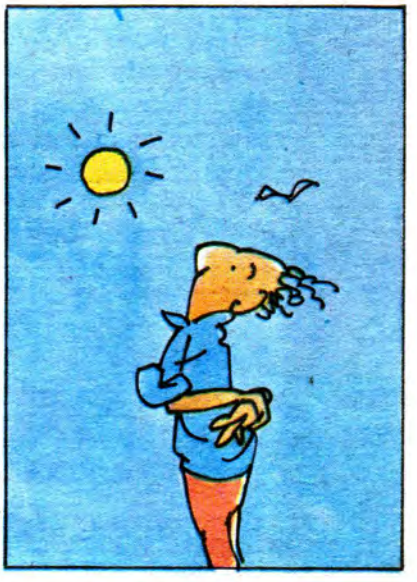

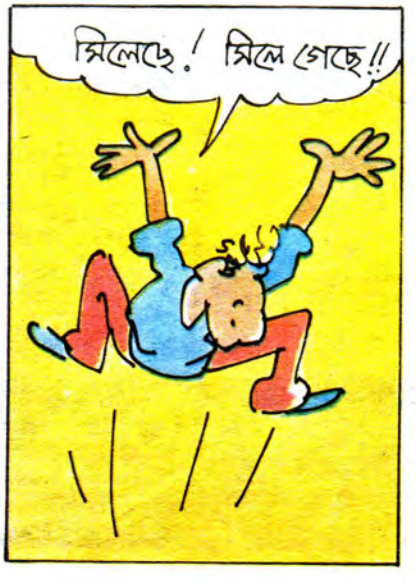

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য উল্লেখযোগ্য পুস্তকাবলী

PHYSICS

পদার্থ বিদ্যা
ডঃ অলক চক্রবর্তী

ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা
ডঃ অলক চক্রবর্তী

পদার্থবিদ্যা উদাহরণিকা
ডঃ অলক চক্রবর্তী ও অধ্যাপক জীবন্তনারায়ণ নাগ

A Text Book on Physics
Dr. ALOK CHAKRABARTY

POLITICAL SCIENCE

পৌরবিজ্ঞানের রূপরেখা
অধ্যাপক অলক ঘোষ ও কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

ECONOMICS

Higher Secondary Economics
ARUN KUMAR SEN
SUSHIL KUMAR SEN
SAMPAT MUKHOPADHYAY

অর্থবিদ্যার রূপরেখা
অধ্যাপক অলক ঘোষ ও
নারায়ণচন্দ্র সাহা

লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মনোজগতে **বিস্ফোরণ** ঘটিয়েছে
এই সব ভালো লাগা বই !!!!!!

BIOLOGICAL SCIENCE

জীববিজ্ঞান
হেমেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ডঃ অজিতকুমার মেদ্দা
ডঃ জীতেন্দ্রনাথ মেদ্দা ও ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান
হেমেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ডঃ অজিতকুমার মেদ্দা
ডঃ জীতেন্দ্রনাথ মেদ্দা ও ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

HISTORY

ইউরোপ ও পৃথিবী
ডঃ দিলীপকুমার ঘোষ

আধুনিক ভারতের ইতিহাস
ডঃ দিলীপকুমার ঘোষ

BUSINESS ECONOMICS

ব্যবসায় অর্থবিদ্যা ও ব্যবসায় গণিত
অধ্যাপক অলক ঘোষ ও ডঃ দিলীপরঞ্জন রায়

ECONOMIC GEOGRAPHY

আর্থনীতিক ভূ-পরিচয়
সুদিনকুমার ভট্টাচার্য

BUSINESS ORGANISATION

Concept of BUSINESS ORGANISATION
By Prof. J. P. Bose

THE NEW BOOK STALL

5/1, RAMANATH MAJUMDER STREET,
CALCUTTA-700009 • PHONE: 34-8291

অখিল ভারতীয়
ক্যামেল
কালার কনটেস্টে যোগ দাও

আমাদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় ২০০০ স্কুলের ১৪ লাখ ছাত্রছাত্রী সাড়া দিয়ে আরও বড় প্রতিযোগিতা ডাকতে বাধ্য করেছে।

তোমাদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিভাকে ক্যামলিন সমাদর করে। ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় যে কোনো স্কুলেরই তুমি অঙ্গীভূত হওনা কেন ক্যামলিন হাতঘড়ি, এলার্ম ঘড়ি এরকম সব সুন্দর উপহার নিয়ে পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে। আমাদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় যোগ দাও তোমার খুশি মত করে আঁকো আর আমাদের দেওয়া ৭০০ প্রাইজের যে কোনো একটা নিয়ে যাও।

বিষয় হিসেবে আঁকার জন্য আমরা তোমাদের ছ'টা প্রিয় বস্তু দেবো — খেলাধুলো, উৎসব, পাখী, প্রজাপতি, ফুল ও জন্তুজানোয়ার। তোমরা কেউ-ই খুব ছোট বা খুব বড় নও প্রাইজ জিতে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে — কারণ আমরা শ্রেণীমান অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করেছি।

(ক) প্রি—প্রাইমারী থেকে স্ট্যাণ্ডার্ড IV
(খ) স্ট্যাণ্ডার্ড V থেকে স্ট্যাণ্ডার্ড VIII
(গ) স্ট্যাণ্ডার্ড IX থেকে স্ট্যাণ্ডার্ড XI

কোনোরকম প্রবেশমূল্য নেই এই প্রতিযোগিতার জন্য। তোমাদের শুধু দরকার প্রবেশপত্র নিয়মাবলীসহ যা পাওয়া যাবে স্টুডেন্ট ও আর্টিস্ট জলরং কেক, স্টুডেন্ট জলরং টিউব, পোস্টার কালার ট্রায়াল প্যাক এবং অয়েল প্যাস্টেলের সংগে।

ক্যামলিন প্রাঃ লিঃ
আর্ট মেটিরিয়াল ডিভিসন,
আন্ধেরী, বোম্বাই-৪০০ ০৫৯

তোমার ক্যামেল রং আজই কেনো
প্রতিযোগিতার সময় ব্যাপ্তি —
জুন—সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

VISION 784 BEN

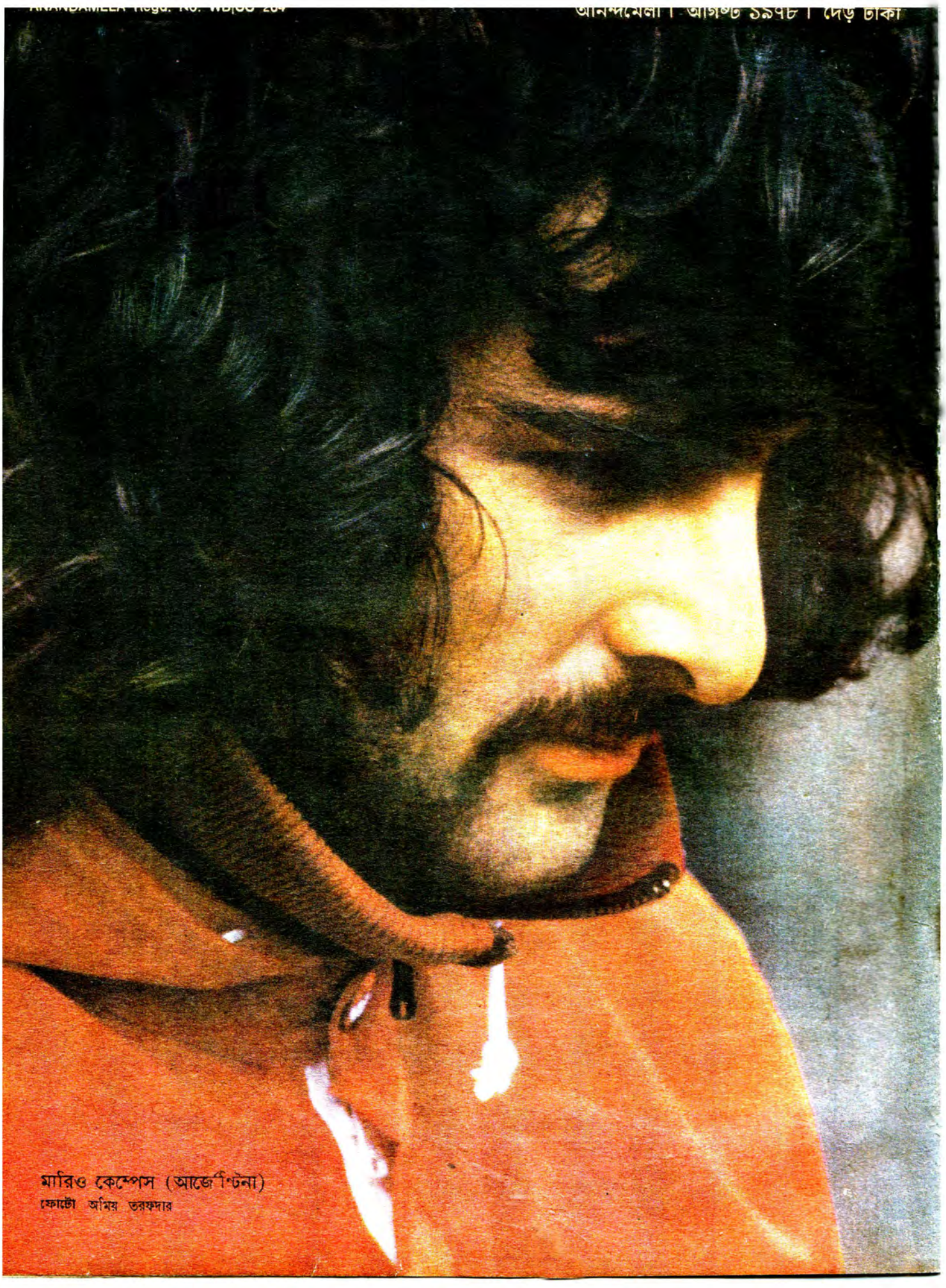

মারিও কেম্পেস (আর্জেন্টিনা)
ফোটো অমিয় তরফদার